Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

দ্বীনি ইলম অর্জনের গুরুত্ব, ফযীলত ও প্রয়োজনীয়তা

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওলানা মাহবুবুর রহমান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

মৌসুমী

রোলঃ 23100120481

৩১ মে, ২০২৬ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

দ্বীনি ইলম অর্জনের গুরুত্ব, ফযীলত ও প্রয়োজনীয়তা

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওলানা মাহবুবুর রহমান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

মৌসুমী

রোলঃ 23100120481

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, " দ্বীনি ইলম অর্জনের গুরুত্ব, ফযীলত ও প্রয়োজনীয়তা " বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে মৌসুমী, আইডিঃ 23100120481 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওলানা মাহবুবুর রহমান
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মাও: আরমান হোসাইন
কুরআন ট্রান্সলেশন ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " দ্বীনি ইলম অর্জনের গুরুত্ব, ফযীলত ও প্রয়োজনীয়তা " শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাওলানা মাহবুবুর রহমান উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব প্রচেষ্টায় প্রস্তুত করা হয়েছে, যেখানে প্রয়োজন অনুসারে বিভিন্ন উৎস থেকে সংগৃহীত তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে এবং সেগুলো যথাযথভাবে তথ্যসূত্রে উল্লেখ করা হয়েছে।

Mousumi
19.05.2026

তারিখঃ

৩১ মে, ২০২৬ ইং

(স্বাক্ষর)

মৌসুমী

আইডিঃ 23100120481

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচিপত্র

ভূমিকা: 6

■ প্রথম অধ্যায় ■ 9

■ ইলমের পরিচয়: 9

■ ইলম ও মা'লুমাতের মাঝে পার্থক্য: 13

■ ইলমের প্রকারভেদ: 14

ইলমের বিস্তারিত শ্রেণী বিভাগ: 14

■ ইলমের উদ্দেশ্য: 15

■ দ্বিতীয় অধ্যায় ■ 18

■ দ্বীনি শিক্ষার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা: 18

■ ইলমের মর্যাদা : 19

■ ইলমের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা: 21

■ ইলম অন্বেষণের ফযীলত ও মর্যাদা: 29

■ তৃতীয় অধ্যায় ■ 49

■ বলা ও করার পূর্বে জ্ঞান আবশ্যক: 49

■ শিশুদের দ্বীনি ইলম অর্জনের গুরুত্ব: 51

■ নারীর দ্বীনি শিক্ষার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা: 52

■ পুরুষের দ্বীনি ইলম অর্জনের গুরুত্ব: 60

■ বড়দের দ্বীনী শিক্ষার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা: 61

■ চতুর্থ অধ্যায় ■ 75

■ ইলম প্রচার- প্রসারের গুরুত্ব: 75

■ তালিবে ইলমের কতিপয় গুণাবলী: 78

■ সাফল্য লাভের উপায় ও শর্তাবলী প্রসঙ্গ: 98

■ জেহেন ও স্মরণ শক্তি প্রসঙ্গ: 102

■ পঞ্চম অধ্যায় ■ 108
■ ইলম অন্বেষণে বিমুখিতা: 108
■ বিপদের ঘনঘটা:.....110
■ ব্যস্ত হওয়া না ব্যস্ত করে রাখা? 114
■ ইলমের প্রতি সালাফের আগ্রহের কিছু নমুনা:.....117
■ সাহাবায়ে কিরাম রা.-এর কিছু দৃষ্টান্ত:.....119
■ ব্যস্ততাকে পাশ কাটিয়ে ইলম অন্বেষণে সালিহিনের জীবনের কিছু খণ্ড চিত্র:.....122
■ ইলম অর্জনের জন্য কিছু সময় নির্ধারণ করে রাখা:.....127
■ প্রযুক্তির মাধ্যমে জ্ঞানার্জন: 131
■ দৃঢ় ইচ্ছাশক্তি ও পরিপূর্ণ নিয়ত:.....134
■ 'অবসর আমাদের জন্য গনিমত:.....138
■ উপসংহার:.....140

ভূমিকা:

ইসলামে ইলমের গুরুত্ব অপরিসীম। মুসলিমের প্রতি ইসলামের প্রথম বার্তা- اِقْرَأْ - পড়, ইলম অর্জন কর। ইসলাম থেকে ইলমকে আলাদা করা অসম্ভব। ইসলামের প্রতিটি অংশের মধ্যেই ইলম বিরাজমান। ইলম ছাড়া যথাযথভাবে ইসলাম পালন সম্ভব নয়। ইলম ছাড়া ব্যক্তিজীবন, পারিবারিক জীবন, সামাজিক জীবন, রাষ্ট্রীয় জীবন- কোনো ক্ষেত্রেই সত্যিকার অর্থে ইসলাম পালন সম্ভব নয়।

দ্বীনী ইলমের বিভিন্ন স্তর ও ভাগ রয়েছে। একটি ভাগ ফরযে আইন ও ফরযে কেফায়া হিসাবে। ফরযে আইন বলা হয়, যা শিক্ষা করা প্রত্যেক মুসলমানের জন্য অপরিহার্য। বিশেষভাবে এই প্রকারের ইলমের ব্যাপারেই হাদীস শরীফে ইরশাদ হয়েছে-

طلب العِلْمِ فَرِيضَةً عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ

"প্রত্যেক মুসলিমের উপর ইলম অর্জন করা ফরয"।-
(মুসনাদে আবু হানীফা (হাছকাফী), হাদীস ১, ২; সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদীস ২২৪)

পবিত্র কুরআনের পুরোটাই ইলম। কুরআন শিক্ষা করা, শিক্ষা দেওয়া, কুরআনের তালীম দেওয়া সবকিছুই ইলম চর্চার মধ্যে শামিল। কুরআনকে আঁকড়ে ধরার ব্যাপারে যত জায়গায় বলা হয়েছে তার মধ্যে কুরআনের ইলম অর্জন করার বিষয়টি আবশ্যকীয়ভাবেই অন্তর্ভুক্ত। কুরআনের ইলম অর্জনের গুরুত্ব কুরআনের মতই। কারণ আল্লাহ পাক কুরআন নাযিল করেছেন, যাতে আমরা এর ইলম অর্জন করি এবং সেই অনুযায়ী আমল করি।
কুরআনে কারীমে আল্লাহ তাআলা নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সম্বোধন করে বলেছেন-
و انزلنا إليك الذكر للبينَ النَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ

"তোমার প্রতি কুরআন অবতীর্ণ করেছি, মানুষকে সুস্পষ্টভাবে বুঝিয়ে দেয়ার জন্য যা তাদের প্রতি অবতীর্ণ করা হয়েছিল, যাতে তারা চিন্তা করে"।-
(সূরা নাহল (১৬): ৪৪)

কুরআনে কারীমের এক আয়াতে আল্লাহ তাআলা তাঁর নবীকে দুআ শিখিয়েছেন।
رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا

“হে আমার প্রভু, আমার ইলম বৃদ্ধি করে দাও”।-(সূরা ত্ব-হা (২০): ১১৫)

আল্লামা কুরতুবী রাহ, বলেন, ইলমের চেয়ে অন্য কোনো আমল যদি আল্লাহর কাছে বেশি প্রিয় হতো তবে তিনি নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সেটা বৃদ্ধির জন্যই দুআ করতে নির্দেশ দিতেন। কুরআনে কারিমে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ইলম ছাড়া অন্য কোনো জিনিস বৃদ্ধির জন্য দুআ করতে নির্দেশ দেওয়া হয়নি।

সর্বপ্রথম কুরআনী ওহীতেই ইলমের প্রতি উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে-

اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ، خلق الإنسان من على .اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم،
عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمُ

“পাঠ কর তোমার প্রতিপালকের নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন- সৃষ্টি করেছেন মানুষকে 'আলাক' হতে। পাঠ কর, আর তোমার প্রতিপালক মহামহিমান্বিত, যিনি কলমের সাহায্যে শিক্ষা দিয়েছেন। শিক্ষা দিয়েছেন মানুষকে, যা সে জানত না”।-
(সূরা আলাক (৯৬): ১-৫)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন-
من يرد الله بِهِ خَيْراً يُفقهه في الدين

“আল্লাহ পাক সার কল্যাণ চান তাকে দ্বীনের সহীহ সমবা দান করেন”।-
(সহীহ বুখারী, হাদীস ৭১; সহীহ মুসলিম, হাদীস ১০৩৭)

আরো ইরশাদ করেছেন-

لا حَسَدَ إِلَّا فِي اثْنَتَيْنِ :رَجُلٌ أتاه الله مالا فسلط على هلكته في الحَقِّ، وَرَجُلٌ أناء الله الحِكْمَةَ فَهُوَ يَقْضِي بِهَا وَيُعْلِّمُهَا.

“দুই ব্যক্তি ব্যতীত অন্য কারো ব্যাপারেই হিংসা হতে পারে না। এক, অল্লাহ পাক যাকে সম্পদ দান করেছেন আর সে ন্যায়ের পথে খরচ করতে থাকে। দুই, যাকে দ্বীনী জ্ঞান দান করেছেন আর সে তা দিয়ে বিচার করে এবং তা মানুষকে শেখায়”।-
(সহীহ বুখারী, হাদীস ৭৩; সহীহ মুসলিম, হাদীস ৮১৬)

হাদীস শরীফে ইলম অন্বেষণের রাস্তাকেও আল্লাহর রাস্তা বলা হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে-

مَنْ خَرَجَ فِي طلب العلم فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ حَتَّى يَرْجِعُ

“যে ব্যক্তি ইলম অন্বেষণের জন্য বের হল সে আল্লাহর রাস্তায় বের হল”।-
(জামে তিরিমিযী, হাদীস ২৬৪৭)

অন্য বর্ণনায় এভাবে এসেছে-
مَنْ جَاءَ مسجدي هذا، لم يأيه إلا لخير يتعلمه أو يُعلمه، فهو بمنزلة المجاهد في سبيل الله

“যেই ব্যক্তি আমার মসজিদে আসল শুধু একারণে যে, সে কোনো কল্যানের বানী শিখবে অথবা শেখাবে সেই ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় জিহাদকারীর ন্যায়”।-
(সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদীস ২২৭; মুসনাদে আহমাদ, হাদীস ৯৪১৯)

■ প্রথম অধ্যায় ■

■ ইলমের পরিচয়:

'ইলম (علم)এর শাব্দিক অর্থ: জ্ঞান ,যা অজ্ঞতা এর বিপরীত। "কোন কিছুকে তার বাস্তব অবস্থা সম্পর্কে দৃঢ়ভাবে জানতে পারা"।

পারিভাষিক সংজ্ঞা: কিছু বিদ্বান বলেছেন, 'ইলম হলো (কোনকিছুর) প্রকৃত অবস্থা জানা। আর এটি অজানা ও অজ্ঞতার বিপরীত"। অন্যান্য বিদ্বানগণ বলেছেন, "নিশ্চয় 'ইলম (কোনকিছুর) প্রকৃত অবস্থা জানার চেয়েও অধিকতর সুস্পষ্ট"।

আর এখানে 'ইলম (জ্ঞান) দ্বারা আমাদের যেটি উদ্দেশ্য সেটি হলো 'ইলমে শার'ঈ (ইসলামী জ্ঞান)। আর 'ইলমে শার'ঈ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো: "আল্লাহ তা'আলা তার রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর উপর যেসব সুস্পষ্ট দলীল-প্রমাণ অবতীর্ণ করেছেন, সেগুলোর 'ইলম '। নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন:
مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّيْنِ

“আল্লাহ যার কল্যান চান, তাকে দ্বীনের সঠিক 'ইলম '(জ্ঞান) দান করেন।”
(ছহীহ আল-বুখারী, হা/৭১, ছহীহ মুসলিম, হা/১৩৩৭, ছহীহ ইবনু হিব্বান, হা/৮৯)

নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরো বলেন,
إِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِيْنَارًا وَلَا دِرْهَما .إِنَّمَا وَرَّثُوا الْعِلْمَ ، فَمَنْ أَخَذَهُ أَخَذَ بِحَظٍّ وَافِرٍ

"নিশ্চয় নবীগণ (আ.) কাউকে দিনার ও দিরহামের (অর্থাৎ দুনিয়াবী কোন জিনিসের) উত্তরাধিকারী বানাননি। প্রকৃতপক্ষে, তারা (মানুষকে) 'ইলম' এর উত্তরাধিকারী বানিয়েছেন। যদি কোন ব্যক্তি 'ইলম' অর্জন করে, তাহলে সে ব্যক্তি অবশ্যই নবীগণ (আ.) এর উত্তরাধিকার থেকে পূর্ণ অংশ অর্জন করতে পারবে"।"
(আত-তিরমিযী; হা/২৬৮২, আবু দাউদ, হা/৩৬৪১, ইবনু মাজাহ, হা/২২৩)

এছাড়াও হাকিমুল উম্মত হযরত থানবী রহ. বলেন, ইলম হলো এমন নূর গোনাহ করলে যা মিটে যায়, গোনাহগার যা হাসিল করতে পারে না। কিছু শব্দ শেখার নামই ইলম নয়। তাই যদি হতো তাহলে জার্মান ও বৈরুতের খৃস্টানরা-যারা আরবী ভাষায় সুপণ্ডিত এবং বড় বড় আদীব-তারাও আলেম হতো। বোঝা গেলো, শুধু শব্দজ্ঞানই ইলম নয়। ইলম প্রকৃতপক্ষে একটা নূর। পবিত্র কুরআনেও একথা এসেছে,

قَدْ جَاءَكُمْ مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَبٌ مُّبِينٌ

"আল্লাহর পক্ষ থেকে তোমাদের নিকট এসেছে নূর ও সুস্পষ্ট কিতাব।" (সুরা মায়েদা -১৫)

আলোচ্য আয়াতে ইলমকে নূর বলা হয়েছে।

অন্য আয়াতে ইলমকে বলা হয়েছে । যেমন-

وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِنْهُ

"আল্লাহ পাক তাকে শক্তিশালী করেছেন ইলম দিয়ে"।
(সুরা মুজাদালাত -২২)

অন্যত্র আল্লাহ পাক ইলমকে সরাসরি নূর বলেছেন,

وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ
"আমি তার জন্য নূর দিয়েছি যার মাধ্যমে সে মানুষের মাঝে চলে।" (সুরা আনআম -১২২)

ইলম এমন নূর যা থাকলে মনে কোনো ভয়-ডর থাকে না। চতুর্দিক থেকে শত্রু ঘিরে ফেললেও ঘাবড়ে যায় না। রাসূল সা. কে একবার একা পেয়ে এক বুদ্ধ খাপখোলা তরবারি উঁচিয়ে বলেছিল, তোমাকে কে বাঁচাবে আমার হাত থেকে? রাসূল সা. তখন অত্যন্ত নিশ্চিতভাবে বলেছেন, আল্লাহ বাঁচাবেন। আল্লাহ সেদিন বাঁচিয়েছেন।

আলেমগণও তেমনি নির্ভীক হয়ে থাকেন। কারণ আল্লাহর ব্যাপারে তাদের রয়েছে পূর্ণ মারেফত। তারা জানেন, আল্লাহ যা ইচ্ছে তাই করতে পারেন। আর আল্লাহর কর্মে কোনো না কোনো হেকমত অবশ্যই থাকে।
(আল ইলমু ওয়াল উলামা)

আর এটি জানা বিষয় যে, নবীগণ (আ.) (মানুষকে) যে 'ইলমের উত্তরাধিকারী বানিয়েছেন, প্রকৃতপক্ষে এটি আল্লাহ্'র শারী'আত (বিধান) সংক্রান্ত 'ইলম'। সেটা অন্য কোন ইলম না। নবীগণ (আ.) মানুষকে কারিগরিবিদ্যা, শিল্পকর্মবিদ্যা এবং এর সাথে সংশ্লিষ্ট বিদ্যার উত্তরাধিকারী বানাননি।

তবে যখন রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মদিনায় আগমন করলেন, তখন তিনি কিছু মানুষকে খেজুর গাছে পরাগায়ন করতে দেখলেন। (আর) যখন তিনি তাদেরকে পরাগায়ন করতে দেখলেন, তখন তিনি একটি কথা বল্লেন অর্থাৎ (তিনি বল্লেন যে,) এটি (পরাগায়ন) করার কোন প্রয়োজন নেই। অতঃপর তারা কথাটি মেনে নিল এবং পরাগায়ন করা ছেড়ে দিল। কিন্তু গাছের খেজুর নষ্ট হয়ে গেল। أَنْتُمْ أَعْلَمُ بِأَمْرِ دُنْيَاكُمْ অতঃপর নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, "তোমাদের দুনিয়াবী বিষয়ে তোমরাই সর্বাধিক জ্ঞানের অধিকারী"।"

আর যদি এটি (পরাগায়ন করার ইলমটি) ঐ ইলম হতো, যার মাঝে প্রশংসা রয়েছে, তাহলে রাসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ বিষয়ে অবশ্যই সর্বাধিক জ্ঞানী হতেন। কেননা 'ইলম ও আমলের কারণে যার সবচেয়ে বেশি প্রশংসা করা হয়, তিনি হলেন নবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। অতএব, 'ইলমে শার'ঈ (ইসলামী জ্ঞান) সেটিই, যেটির মাঝে প্রশংসা রয়েছে। আর প্রশংসাটি ইলমে শার'ঈ অন্বেষণকারীর জন্যই নির্দিষ্ট। কিন্তু তা সত্ত্বেও অন্যান্য 'ইলমগুলোর উপকারিতা অস্বীকার করছি না। যদি অন্যান্য ইলমগুলো আল্লাহ্'র আনুগত্যের ব্যাপারে ও আল্লাহ্'র দ্বীনকে সমর্থনের ব্যাপারে সহযোগিতা করে এবং যদি ঐসকল 'ইলমের দ্বারা আল্লাহ্'র বান্দারা উপকৃত হয়; তাহলে ঐসকল ইলম উত্তম ও কল্যাণকর হবে। আর কিছু এলাকায় কখনো কখনো ঐগুলো শিক্ষা করা ওয়াজিব (আবশ্যক) হয়ে যায়; যখন ঐসকল ইলম (জ্ঞান) আল্লাহ তা'আলার এ বাণীর অন্তর্ভুক্ত হয়।

وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَ مِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ

"(হে মুসলমান সম্প্রদায়!) তোমরা তাদের (তোমাদের শত্রুদের মোকাবেলার) জন্য তোমাদের সাধ্যানুযায়ী শক্তি এবং সুসজ্জিত অশ্ববাহিনী প্রস্তুত রাখো"। (সূরাহ আল-আনফাল, ৮:৬০)

অধিকাংশ বিদ্বানগণ উল্লেখ করেছেন যে, কারিগরিবিদ্যা/শিল্পকর্মবিদ্যা শিক্ষা করা 'ফরযে কিফায়া' (যৌথভাবে পালনীয় ফরয)।

কেননা মানুষের জন্য কিছু পাত্র অপরিহার্য, যেগুলোর সাহায্যে তারা রান্না করে, পানি পান করে এবং অন্যান্য কাজগুলো করে, যে কাজগুলোর দ্বারা তারা উপকৃত হয়। অতএব, যখন এমন কোন ব্যক্তিকে পাওয়া যাবে না, যে ব্যক্তি ঐ শিল্পকর্মগুলোর দায়িত্ব গ্রহন করবে এবং (ঐগুলোর জন্য) কারখানা/ফ্যাক্টরি তৈরি করবে; তখন ঐ সকল বিদ্যা শিক্ষা করা 'ফরযে কিফায়াহ' (যৌথভাবে পালনীয় ফরয বা কর্তব্য) হয়ে যাবে। (বিদ্বানগণ আরও বলেছেন যে,) আর এটিই (ফরযে কিফায়াহ) আলিমগণের মাঝে বিতর্কের ক্ষেত্র। সর্বাবস্থায় এটি বলতে পছন্দ করি:

إِنَّ الْعِلْمَ الَّذِي هُوَ مَحَلَّ الثَّنَاءِ، هُوَ الْعِلْمُ الشَّرْعِيُّ الَّذِي هُوَ فِقْهُ كِتَابِ اللَّهِ وَ سُنَّةِ رَسُوْلِهِ

"নিশ্চয় ঐ 'ইলম (জ্ঞান), যেটি প্রশংসার ক্ষেত্র ও স্থান; সেটিই 'ইলমে শার'ঈ (ইসলামী জ্ঞান)। যা আল্লাহ্'র কিতাব (আল-কুরআন) এবং তার রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সুন্নাহ্'র বুঝ/উপলব্ধি।"
(ছহীহ মুসলিম; হা/২৩৬৩)

আর এটি ('ইলমে শার'ঈ) ছাড়া অন্যান্য 'ইলম', হয় ভাল কাজের জন্য মাধ্যম হবে, না হয় খারাপ কাজের জন্য মাধ্যম হবে। সুতরাং ঐ ইলম যে কাজের জন্য মাধ্যম হবে, সে কাজ অনুসারে ঐ ইলমের বিধান নির্ধারিত হবে।

■ ইলম ও মা'লুমাতের মাঝে পার্থক্য:

হাকিমুল উম্মত থানবী রহ. বলেন, ইলম ও মা'লুমাত এক নয়, সম্পূর্ণ ভিন্ন জিনিস। যেমন ক্ষীণ দৃষ্টির কেউ হাজার মাইল সফর করলেও তার দেখাশোনা হয় কম। তাছাড়া যা দেখে তা-ও ভাসাভাসা। পক্ষান্তরে তীক্ষ্ণ দৃষ্টির কেউ এরচে' কম সফর করেও বেশি দেখতে পারে। ব্যাপারটা ঠিক তেমনি। আমাদের মাঝে আর হাজি ইমদাদুল্লাহ মুহাজেরে মক্কী সাহেবের মাঝে পার্থক্য ঠিক তেমনি। আমাদের জানাশোনা বেশি, কিন্তু অন্তরের উপলব্ধি কম। আর হাজী সাহেবের জানাশোনা কম, কিন্তু অন্তরের উপলব্ধি বেশি। প্রকৃত ইলম হলো, সুস্থ উপলব্ধি যা সঠিক পথ দেখায় এবং নিশ্চিন্ত গন্তব্যে পৌঁছায়। এই ইলম শুধু পড়াশোনার মাধ্যমে হাসিল হয় না। এর প্রধান উপায় হলো, দোয়া-মুনাজাত ও তাকওয়া-পরহেজগারি।

আলেম কাকে বলে? মুত্তাকী ও মুত্তাবিয়ে সুন্নাতকে আলেম বলে। কেননা মওলবীর নিসবত মাওলার দিকে; মানে মাওলাওয়ালা তথা আল্লাহওয়ালা।

■ ইলমের প্রকারভেদ:

বিভিন্ন বিষয়ের উপর ভিত্তি করে ইলমকে বিভিন্ন ভাবে ভাগ করা যায়।
তবে,ইলম (জ্ঞান) প্রধানত দুই প্রকার:
১) ইলমুদ দুনিয়া (পার্থিব জ্ঞান) এবং
২) ইলমুদ দ্বীন (দ্বীনি জ্ঞান)।

দ্বীনি জ্ঞান আবার দুই ভাগে বিভক্ত:
ক)ইলমুল মাবাদি (যে জ্ঞান শরীয়তের মূল সূত্রের ওপর নির্ভরশীল) এবং
খ)ইলমুল মাকাসিদ বা ইলমুস শরয়িয়াহ (কোরআন, সুন্নাহ ও ফিকহের জ্ঞান)।

এছাড়াও জ্ঞান অর্জনের পদ্ধতির দিক থেকে ইলম জরুরি (বাধ্যতামূলক) ও নজরি (গবেষণা নির্ভর) দুভাগে বিভক্ত।

ইলমের বিস্তারিত শ্রেণী বিভাগ:

১)ইলমুদ দুনিয়া (পার্থিব জ্ঞান): দুনিয়ার কর্মসংস্থান, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, চিকিৎসা ইত্যাদি সংক্রান্ত জ্ঞান, যা অর্জনে মানবজাতির কল্যাণ রয়েছে।
২)ইলমুদ দ্বীন (দ্বীনি জ্ঞান): পবিত্র কোরআন, সুন্নাহ, ফিকহ (শরীয়তের বিধান) ও ঈমান সংক্রান্ত জ্ঞান।

জ্ঞান অর্জনের আবশ্যকতা অনুযায়ী ইলমের প্রকারভেদ:
১)ফরজে আইন (فرض عين): প্রত্যেক মুসলমানের ওপর অপরিহার্য জ্ঞান, যেমন- আকিদা-বিশ্বাস, নামাজ, রোজা, পবিত্রতা ও হালাল-হারাম সংক্রান্ত জরুরি জ্ঞান।

২)ফরজে কিফায়া (فرض كفاية): সমাজের কিছু লোক অর্জন করলে সবার পক্ষ থেকে আদায় হয়ে যায়। যেমন- গভীর তাফসীর, হাদীস শাস্ত্র, ফিকহ বা মুফতি হওয়ার জ্ঞান।

উৎস ও বিষয়বস্তুর ওপর ভিত্তি করে:

ক)মৌলিক ইলম (উলুম আসলিয়্যাহ): কুরআন ও সুন্নাহ সরাসরি অধ্যয়ন (তাফসীর, হাদীস)।
খ)সহায়ক ইলম (উলুমুল আলা/সিনাইয়্যা): মৌলিক জ্ঞান বোঝার মাধ্যম, যেমন- নাহু-সরফ (আরবি ব্যাকরণ), বালাগাত (অলংকার শাস্ত্র)।
গ)ইলমুত তাওহীদ: আল্লাহর একত্ববাদ সম্পর্কিত জ্ঞান।
ঘ)ইলমুল ফিকহ: ইসলামী আইন ও বিধি-বিধান।
ঙ)ইলমুস সির/তাসাউফ: অন্তরের পবিত্রতা ও আত্মশুদ্ধির জ্ঞান।

■ ইলমের উদ্দেশ্য:

ইসলামে ইলম বা জ্ঞান অর্জনের মূল উদ্দেশ্য হলো একমাত্র মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন, সঠিক পথ (সিরাতে মুস্তাকীম) জানা, নিজের মূর্খতা দূর করা এবং অর্জিত জ্ঞানের আলোকে আমল করে ইহকাল ও পরকালে কল্যাণ লাভ করা। এটি আল্লাহর আদেশ-নিষেধ ও তাওহীদ বোঝার মাধ্যম।

ইলম অর্জনের প্রধান উদ্দেশ্যসমূহ নিচে দেওয়া হলো:

আল্লাহর সন্তুষ্টি ও পরিচয়: ইলম অর্জনের একমাত্র উদ্দেশ্য হবে আল্লাহর সন্তুষ্টি । জ্ঞান অর্জনের মাধ্যমে আল্লাহর সৃষ্টিরহস্য ও তাঁর গুণাবলী সম্পর্কে জানা যায়।

সঠিক আমল ও ইবাদত: অজ্ঞতার কারণে ভুল আমল বা ইবাদত কবুল হয় না। সঠিক তাওহীদ, সুন্নাত ও ফরয বিষয়গুলো জানার জন্য ইলম প্রয়োজন, যা ইবাদতের মূল।

ইলমের দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, ইলম অনুযায়ী আমল করা। আল্লাহ পাক আমার ওপর কী আদেশ করেছেন আর কী নিষেধ করেছেন তা জানা
এবং সে অনুযায়ী আমল করা। গুটিকতক কিতাবের মা'লুমাত হাসিল করার নামই ইলম নয়। সাহাবায়ে কেরাম যা শিখতেন সঙ্গে সঙ্গে আমল শুরু করে দিতেন। এক আয়াত শিখে তা আমলে পরিণত করে দ্বিতীয় আয়াত শুরু করতেন।

হযরত আবু বকর সিদ্দীক রা. ছিলেন আরব। তার মাতৃভাষা ছিল আরবী। আরবী শিখতে তার নাহু-সরফের প্রয়োজন হয়নি। এদিকে কুরআন শরীফও নাযিল হয়েছে আরবী ভাষায়। স্বভাবতই কুরআন বোঝার জন্য তার তরজমার প্রয়োজন হয়নি। তবুও তিনি বলেছেন, সূরায়ে বাকারা শিখতে আমার দু'বছর লেগে গেছে। একজন আরবভাষীর সূরায়ে বাকারা শিখতে দু'বছর লাগার কী কারণ? কারণ এটাই যে, এক আয়াত পড়ে আমলে অভ্যস্ত হয়ে দ্বিতীয় আয়াত শুরু করতেন।

মূর্খতা দূরীকরণ: নিজের ও সমাজের জাহেলিয়াত বা মূর্খতা দূর করে সঠিক পথের দিশা পাওয়া।
পবিত্র কোরআন এ আল্লাহ তায়ালা বলেন:

أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ ۗ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ۗ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ

"যে ব্যক্তি রাত্রিকালে সেজদার মাধ্যমে অথবা দাঁড়িয়ে এবাদত করে, পরকালের আশংকা রাখে এবং তার পালনকর্তার রহমত প্রত্যাশা করে, সে কি তার সমান, যে এরূপ করে না; বলুন, যারা জানে এবং যারা জানে না; তারা কি সমান হতে পারে? চিন্তা-ভাবনা কেবল তারাই করে, যারা বুদ্ধিমান।"
(সূরা যুমার:০৯)

জান্নাতের পথ সুগম করা: ইলম অর্জনের পথে থাকলে আল্লাহ জান্নাতের পথ সহজ করে দেন এবং ফেরেশতারা জ্ঞান অন্বেষণকারীর ওপর সন্তুষ্ট হয়ে ডানা বিছিয়ে দেন।

হাদীস শরীফে ইলম অন্বেষণের রাস্তাকেও আল্লাহর রাস্তা বলা হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে-

مَنْ خَرَجَ فِي طلب العلم فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ حَتَّى يَرْجِعُ

"যে ব্যক্তি ইলম অন্বেষণের জন্য বের হল সে আল্লাহর রাস্তায় বের হল"।-
(জামে তিরিমিযী, হাদীস ২৬৪৭)

অন্য বর্ণনায় এভাবে এসেছে-
مَنْ جَاءَ مسجدي هذا، لم يأيه إلا لخير يتعلمه أو يُعلمه، فهو بمنزلة المجاهد في سبيل الله

"যেই ব্যক্তি আমার মসজিদে আসল শুধু একারণে যে, সে কোনো কল্যানের বানী শিখবে অথবা শেখাবে সেই ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় জিহাদকারীর ন্যায়"।-
(সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদীস ২২৭; মুসনাদে আহমাদ, হাদীস ৯৪১৯)

দুনিয়ার কল্যাণ ও আখিরাত: ইলম মানুষকে দুনিয়াতে সঠিক পথ দেখায় এবং আখিরাতে জান্নাত অর্জনের মাধ্যম।

আদর্শ চরিত্র গঠন: ইলম অর্জনের মাধ্যমে মানুষের মধ্যে মানবিক গুণাবলী ও শিষ্টাচার (আদব) তৈরি হয়।

সতর্কতা: লোক দেখানো বা অহংকার করার উদ্দেশ্যে জ্ঞান অর্জন করা ইসলামে নিষিদ্ধ। কুরআনের প্রথম নির্দেশই ছিল— পড়ো। এটি প্রমাণ করে যে জ্ঞান অর্জনের মূল উদ্দেশ্য হওয়া উচিত একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন এবং সঠিক পথনির্দেশনা লাভ করা। রিয়া বা লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে ইলম অর্জন করা ইসলামে নিষিদ্ধ।

■ দ্বিতীয় অধ্যায় ■

■ দ্বীনি শিক্ষার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা:

ইসলামে দ্বীনি শিক্ষার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। একজন মুসলিমের প্রতি ইসলামের প্রথম বার্তাই হলো اِقْرَأْ তথা পড়, ইলম অর্জন কর। ইসলাম থেকে শিক্ষাকে আলাদা করা অসম্ভব। কারণ, ইসলামের প্রতিটি অংশের মধ্যেই শিক্ষা বিদ্যমান। জ্ঞান ছাড়া যথাযথভাবে ইসলাম পালন সম্ভব নয়। দ্বীনি শিক্ষা ছাড়া ব্যক্তিজীবন, পারিবারিক জীবন, সামাজিক জীবন, রাষ্ট্রীয় জীবন কোন ক্ষেত্রেই সত্যিকার অর্থে ইসলাম পালন সম্ভব নয়। তাবেঈ উমার ইবনু আব্দুল আযীয (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন,

من عمل على غير علم كان ما يفسد أكثر مما يصلح ‘যে ব্যক্তি দ্বীনি শিক্ষা ছাড়া আমল করবে সে সঠিকভাবে যতটুকু করবে না করবে, বরবাদ করবে তার চেয়ে বেশি’।[১]

ইমাম আহমদ ইবনু হাম্বল (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন,

الناس إلى العلم أحوج منهم إلى الطعام والشراب، لأن الرجل يحتاج إلى الطعام والشراب في اليوم مرة أو مرتين وحاجته إلى العلم بعدد أنفاسه

‘মানুষ খাদ্য ও পানীয়ের তুলনায় ইলমের প্রতি অধিক মুখাপেক্ষী। কেননা একজন ব্যক্তির দিনে একবার বা দু’বার খাবারের প্রয়োজন পড়ে। কিন্তু ইলমের প্রতি তার প্রয়োজনীয়তা তার নিঃশ্বাস পরিমাণ’।[২]

দ্বীনি ইলমের বিভিন্ন স্তর ও ভাগ রয়েছে। একটি ভাগ ফরযে আইন ও ফরযে কেফায়া হিসাবে। ফরযে আইন বলা হয়, যা শিক্ষা করা প্রত্যেক মুসলিমের জন্য অপরিহার্য। বিশেষভাবে এই প্রকারের ইলমের ব্যাপারেই হাদীছে বর্ণিত হয়েছে। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন,

طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيْضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ

‘প্রত্যেক মুসলিমের উপর ইলম অর্জন করা ফরয’।[৩]

অপর ভাগ হল ফরযে কিফায়া, যা কিনা কিছু মানুষ অর্জন করলেই যথেষ্ট হবে।

■ ইলমের মর্যাদা :

(ক) কুরআনুল কারীম হতে: সর্বপ্রথম কুরআনী ওহীতেই ইলমের প্রতি উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ، خلق الإنسان من على .اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ

'পাঠ করুন আপনার প্রতিপালকের নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন- সৃষ্টি করেছেন মানুষকে জমাট রক্ত হতে। পাঠ করুন, আর আপনার প্রতিপালক মহামহিমান্বিত, যিনি কলমের সাহায্যে শিক্ষা দিয়েছেন। শিক্ষা দিয়েছেন মানুষকে, যা সে জানত না' (সূরা আল-'আলাক্ব: ১-৫)।

জ্ঞানী ও অন্যদের মর্যাদার তারতম্য সম্পর্কে অপর এক আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ

'(হে নবী!) আপনি বলুন, যারা জানে এবং যারা জানে না তারা কি সমান?' (সূরা আয-যুমার: ৯)। জ্ঞানীদের মর্যাদা বৃদ্ধি প্রসঙ্গে কুরআনুল কারীমের অন্যত্র বর্ণিত হয়েছে,

يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ

'তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছে এবং যাদেরকে ইলম দান করা হয়েছে আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে মর্যাদায় উন্নত করবেন' (সূরা আল-মুজাদালাহ: ১১)।

(খ) হাদীছুন নববী হতে: রাসূলুল্লাহ (ﷺ) ইরশাদ করেছেন, مَنْ يُرِدِ الله بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّيْنِ 'আল্লাহ পাক যার কল্যাণ চান তাকে দ্বীনের ছহীহ জ্ঞান দান করেন'।[৪] জ্ঞানের ব্যাপারে হিংসার বৈধতা সম্পর্কে তিনি আরো বলেছেন,

لَا حَسَدَ إِلَّا فِي اثْنَتَيْنِ :رَجُلٌ آتَاهُ اللهُ مَالًا فَسُلِّطَ عَلَى هَلَكَتِهِ فِي الحَقِّ، وَرَجُلٌ آتَاهُ اللهُ الحِكْمَةَ فَهُوَ يَقْضِي بِهَا وَيُعَلِّمُهَا

‘দুই ব্যক্তি ব্যতীত অন্য কারো ব্যাপারেই হিংসা হতে পারে না। প্রথমতঃ আল্লাহ পাক যাকে সম্পদ দান করেছেন আর সে ন্যায়ের পথে খরচ করতে থাকে। দ্বিতীয়তঃ যাকে দ্বীনি জ্ঞান দান করেছেন আর সে তা দিয়ে বিচার করে এবং তা মানুষকে শেখায়’।[৫]

অন্য হাদীছে এসেছে,مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهّلَ اللهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنّةِ ‘যেই ব্যক্তি ইলম তলবের জন্য কোন পথ অবলম্বন করবে আল্লাহ পাক এর বদৌলতে তার জন্য জান্নাতের পথ সহজ করে দেবেন’।[৬]

ছাফওয়ান ইবনু আস্সাল (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, আমি রাসূল (ﷺ)-এর কাছে আসলাম। তখন তিনি মসজিদে বসে ছিলেন। আমি তাঁকে বললাম, হে আল্লাহর রাসূল (ﷺ)! আমি এসেছি ইলম শিক্ষা করার জন্য। তিনি বললেন, ‘তালেবে ইলমকে মারহাবা। নিশ্চয় তালেবে ইলমকে ফিরিশতাগণ বেষ্টন করে রাখে এবং তাঁদের ডানা দিয়ে তাকে ছাঁয়া দিতে থাকে। অতঃপর তাঁরা সারিবদ্ধভাবে প্রথম আসমান পর্যন্ত মিলে মিলে দাঁড়িয়ে যায়। এসব কিছু তাঁরা সে যা অন্বেষণ করছে তার ভালোবাসায় করে’।[৭]

হাদীছে ইলম অন্বেষণের রাস্তাকেও আল্লাহর রাস্তা বলা হয়েছে। যেমন, مَنْ خَرَجَ فِيْ طَلَبِ العِلْمِ فَهُوَ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ حَتَّى يَرْجِعَ. ‘যে ব্যক্তি ইলম অন্বেষণের জন্য বের হল সে আল্লাহর রাস্তায় বের হল’।[৮]

অন্য বর্ণনায় এসেছে,

مَنْ جَاءَ مَسْجِدِيْ هَذَا، لَمْ يَأْتِهِ إِلّا لِخَيْرٍ يَتَعَلّمُهُ أَوْ يُعَلِّمُهُ، فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الْمُجَاهِدِ فِي سَبِيْلِ اللهِ

‘যে ব্যক্তি আমার মসজিদে আসল শুধু একারণে যে, সে কোন কল্যাণের বাণী শিখবে অথবা শেখাবে সেই ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় জিহাদকারীর ন্যায়’।[৯] অপর এক হাদীছে আরো বর্ণিত হয়েছে,

إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ :إِلّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ ،أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُوْ لَهُ

‘যখন মানুষ মারা যায় তার সকল আমলের রাস্তা বন্ধ হয়ে যায়। শুধু তিনটি রাস্তা খোলা থাকে। এক. ছদকায়ে জারিয়া। দুই. এমন ইলম, যা থেকে (মানুষ) উপকৃত হয়। তিন. নেক সন্তান, যে তার জন্য দু’আ করে’।[১০]
আরো ইরশাদ হয়েছে, خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ ‘তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম ঐ ব্যক্তি, যে কুরআন মাজীদ শিক্ষা করে এবং শিক্ষা দেয়’।[১১]

■ ইলমের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা:

(১) মহান আল্লাহর প্রথম সৃষ্টি কলম: কলম ইলম অর্জনের মাধ্যম। আল্লাহ তা‘আলা প্রথম কলম সৃষ্টি করেছেন। ওবাদাহ ইবনু ছামিত (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন,

إِنَّ أَوَّلَ مَا خَلَقَ اللهُ الْقَلَمَ فَقَالَ اكْتُبْ. فَقَالَ مَا أَكْتُبُ قَالَ اكْتُبِ الْقَدَرَ مَا كَانَ وَمَا هُوَ كَائِنٌ إِلَى الأَبَدِ

‘আল্লাহ তা‘আলা সর্বপ্রথম কলম সৃষ্টি করে তাকে আদেশ করেন, ‘লিখ’। কলম বলল, কী লিখব? তিনি বললেন, তাক্বদীর লিখ, যা হয়েছে এবং অনন্তকাল পর্যন্ত যা হবে সবকিছুই’।[১২]

কলম ও লেখালেখি সম্পর্কে কিছু কথা: সর্বপ্রথম কলম সৃষ্টির কারণে ইলমের গুরুত্ব ও ফযীলত প্রমাণিত হয়। আর এই লেখনির মাধ্যমেই যুগ যুগ ধরে ইলম সংরক্ষিত হয়ে আসছে। কুরআন নাযিল হওয়ার পর ছাহাবীগণ সাথে সাথে কুরআন লিখে নিয়েছেন। এছাড়াও কুরআনুল কারীমের ২৯তম পারায় ৬৮তম সূরা হল ‘সূরা আল-

ক্বলম’। উমার ইবনুল খাত্তাব ও আনাস ইবনু মালেক (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত, তারা বলেছেন, قيّدوا العلم بالكتابة ‘তোমরা ইলমকে লেখনীর দ্বারা বন্দী করে ফেল’।[১৩]

লিখে রাখার কারণে আমরা হাদীছ পেয়েছি। আবূ হুরায়রা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম (ﷺ)-এর ছাহাবীগণের মধ্যে আব্দুল্লাহ ইবনু আমর (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) ব্যতীত আর কারো নিকট আমার চেয়ে অধিক হাদীছ নেই। কারণ তিনি লিখে রাখতেন আর আমি লিখতাম না।[১৪]
আবূ হুরায়রা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, অতঃপর ইয়ামানবাসী জনৈক ব্যক্তি এসে বলল, اُكْتُبْ لِيْ يَا رَسُوْلَ اللهِ. فَقَالَ اكْتُبُوْا لِأَبِيْ فُلَانٍ ‘হে আল্লাহর রাসূল (ﷺ)! (এ কথাগুলো) আমাকে লিখে দিন। তিনি (ছাহাবীদের) বললেন, তোমরা অমুকের পিতাকে লিখে দাও’।[১৫]

(২) ইলমের কারণে আদম (আলাইহিস সালাম)-কে ফেরেশতাদের উপরে মর্যাদা দেয়া হয়: আল্লাহ তা‘আলা আদমকে সৃষ্টি করে তার সম্মানার্থে ফেরেশতাদেরকে সিজদা করার আদেশ করলে ফেরেশতাগণ সিজদা করেন। অতঃপর আল্লাহ তা‘আলা আদম (আলাইহিস সালাম)-কে সৃষ্টি করে ইলম শিক্ষা দিলেন এবং ফেরেশতাদের সামনে উপস্থাপন করলেন। মহান আল্লাহ বলেন,

وَ عَلَّمَ اٰدَمَ الْاَسْمَآءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلٰٓئِكَةِ ۙ فَقَالَ اَنْۢبِـُٔوْنِيْ بِاَسْمَآءِ هٰٓؤُلَآءِ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ- قَالُوْا سُبْحٰنَكَ لَا عِلْمَ لَنَآ اِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا ؕ اِنَّكَ اَنْتَ الْعَلِيْمُ الْحَكِيْمُ

‘অতঃপর আল্লাহ আদমকে সকল বস্তুর নাম শিক্ষা দিলেন। অতঃপর সেগুলোকে ফেরেশতাদের সম্মুখে পেশ করলেন এবং বললেন, তোমরা আমাকে এগুলোর নাম বল, যদি তোমরা (তোমাদের কথায়) সত্যবাদী হও। তারা বলল, সকল পবিত্রতা আপনার জন্য। আমাদের কোন জ্ঞান নেই, যতটুকু আপনি আমাদের শিখিয়েছেন ততটুকু ব্যতীত। নিশ্চয় আপনি মহা বিজ্ঞ ও প্রজ্ঞাময়’ (সূরা আল-বাক্বারাহ : ৩১-৩২)। অতঃপর তিনি আদমকে বললেন, ‘হে আদম! তুমি এদেরকে ঐসবের নামগুলো বলে দাও। অতঃপর যখন আদম তাদেরকে ঐসবের নামগুলো বলে দিল,

তখন আল্লাহ ফেরেশতাদের বললেন, আমি কি তোমাদের বলিনি যে, আসমান ও যমীনের অদৃশ্য বিষয় সমূহ আমি সর্বাধিক অবগত এবং তোমরা যেসব বিষয় প্রকাশ কর ও যেসব বিষয় গোপন কর, সকল বিষয়ে আমি সম্যক অবহিত?' (সূরা আল-বাক্বারাহ: ৩৩)। এরপর আল্লাহ আদমকে সম্মানসূচক সিজদা করার জন্য ফেরেশতাদের আদেশ দিলেন' (সূরা আল-বাক্বারাহ: ৩৩-৩৪)।

(৩) জ্ঞানের কারণে দুনিয়ায় মানুষকে সম্মান প্রদান করা হয়েছে: পৃথিবীতে যাকেই আল্লাহ সম্মানিত করেছেন ও আদর্শ বানিয়েছেন, তা করেছেন জ্ঞানের কারণে। কুরআনে নবী-রাসূল নন এমন কতক মর্যাদাবান ব্যক্তির আলোচনা এসেছে। যেমন- ১. খিযির (সূরা আল-কাহফ: ৬৫)। ২. লুক্বমান (সূরা লুক্বমান: ১২) এবং ৩. ত্বালূত (সূরা আল-বাক্বারাহ: ২৪৭)।

(৪) দ্বীনি শিক্ষা সকল ইবাদতের মূল: যে কোন আমল আল্লাহর কাছে কবুলযোগ্য হওয়ার জন্য কয়েকটি শর্ত রয়েছে।

আমল কবুলের শর্ত তিনটি।

যথা: (১) আক্বীদা বিশুদ্ধ হওয়া

(২) তরীকা সঠিক হওয়া এবং

(৩) ইখলাছে আমল।

অর্থাৎ কাজটি নিঃস্বার্থভাবে কেবল আল্লাহর ওয়াস্তে হওয়া।[১৬] আর এগুলো জানার জন্য ইলমের প্রয়োজন। এছাড়াও তাওহীদ, শিরক, সুন্নাত, বিদ'আত জানার জন্যও ইলমের প্রয়োজন। 'আল্লাহ দুনিয়াতে দু'টি রাস্তা দেখিয়েছেন' (সূরা আল-বালাদ:১০), 'একটি শুকরিয়ার অন্যটি কুফরীর' (সূরা আদ-দাহর: ৩)। 'একটি শয়তানের অন্যটি রহমানের'। এগুলো জানার জন্য যেমনভাবে ইলমের প্রয়োজন। অনুরূপভাবে হক-বাতিল বা সঠিক-বেঠিক জানার জন্য ইলমের প্রয়োজন। ছালেহ আল-উছায়মীন (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন,' ইলম অর্জন আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ'। ... আল্লাহ তা'আলা দ্বীনের বুঝকে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদের সমতুল্য করেছেন। বরং তদপেক্ষা বেশী। কারণ ইলম ছাড়া মুজাহিদ জিহাদ করতে পারে না; মুছল্লী ছালাত আদায় করতে পারে না; যাকাত আদায়কারী যাকাত দিতে পারে না; ছায়েম ছিয়াম পালন করতে পারে না; হাজী হজ্জ করতে পারে না; ওমরাহকারী ওমরাহ করতে পারে না; খাদ্য

গ্রহণকারী খাদ্য খেতে পারে না; পানকারী পান করতে পারে না; ঘুমন্ত ব্যক্তি ঘুমাতে পারে না; জাগ্রত ব্যক্তি ঘুম থেকে জাগতে পারে না। তাই ইলম হল সবকিছুর মূল’।[১৭]

(৫) আক্বীদা ও আমল ছহীহ হওয়ার ভিত্তি ইলম: কথা ও কাজের পূর্বশর্ত হল ইলম। হাফেয ইবনুল ক্বাইয়িম (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন,

إن العلم إمام العمل، وقائد له، والعمل تابع له ومؤتم به، فكل عمل لايكون خلف العلم مقتديا به فهو غير نافع لصاحبه، بل مضر عليه، كما قال بعض السلف :من عبد الله بغير علم كان ما يفسد أكثر مما يصلح

‘নিশ্চয় ইলম আমলের নেতা ও তার পরিচালক। আর আমল ইলমের অনুগামী ও তার অনুসারী। আমল যদি ইলমের পিছনে না থাকে এবং তার অনুসারী না হয় তাহলে তা তার জন্য উপকারী হবে না। বরং তার জন্য ক্ষতিকর হবে। যেমন কোন একজন সালাফ বলেছেন, ‘ইলম ছাড়া যে আল্লাহর ইবাদত করে সে কল্যাণের চেয়ে বেশী ক্ষতি করে’।[১৮]

(৬) সম্পদের চেয়ে ইলম উত্তম: সকল মানুষই সম্পদের প্রতি আগ্রহী হয়ে থাকে। অথচ দুনিয়া ও আখেরাতে তার সম্পদের তুলনায় ইলম অনেক বেশী উপকারী ও উত্তম। আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন,

العلمُ خيرٌ مِن المالِ، العلمُ يحرُسُكَ، وأنتَ تحرُسُ المال، المالُ يُنقِصُه النفقةُ، والعلمُ يزكو على الإنفاقِ، ‘

‘সম্পদের চেয়ে জ্ঞান উত্তম। জ্ঞান আপনাকে রক্ষা করে আর আপনি সম্পদকে রক্ষা করেন। অর্থ ব্যয় করলে কমে যায় আর জ্ঞান ব্যয় করলে বৃদ্ধি পায়’।[১৯] ইবনুল ক্বাইয়িম (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন, ‘অনেক দিক থেকে সম্পদের চেয়ে ইলমের মর্যাদা বেশী’।[২০] যেমন,

১. ইলম হল নবীগণের মীরাছ আর সম্পদ হল ধনীদের মীরাছ।

২. নিশ্চয় ইলম তার মালিককে পাহারা দেয়, কিন্তু সম্পদ মালিককে পাহারা দেয় না, বরং মালিককে তার সম্পদ পাহারা দিতে হয়।

৩. সম্পদ খরচ করলে কমে যায়, আর ইলম খরচ করলে বৃদ্ধি পায়।

৪. নিশ্চয় সম্পদের মালিক মারা গেলে তার থেকে সম্পদ পৃথক হয়ে যায়, আর ইলম তার মালিকের সাথে কবরে প্রবেশ করবে।

৫. সম্পদের উপর ইলমের হুকুম প্রযোজ্য হয়, কিন্তু ইলমের উপর সম্পদের হুকুম প্রযোজ্য হয় না।

৬. সম্পদ মুমিন-কাফের ও ভালো-মন্দ সকলে অর্জন করতে পারে। কিন্তু উপকারী ইলম মুমিন ছাড়া কেউ অর্জন করতে পারে না।

৭. সম্পদ মানুষকে অবাধ্যতা, অহংকার ও হিংসার দিকে নিয়ে যায় আর ইলম মানুষকে বিনয় ও আল্লাহর ইবাদতের দিকে নিয়ে যায়।

৮. সম্পদের মালিকের দরিদ্র হওয়ার সম্ভাবনা আছে কিন্তু ইলমের মালিকের দরিদ্র হওয়ার সম্ভাবনা নেই।

৯. নিশ্চয় ইলম মানুষকে আল্লাহর দিকে ধাবিত করে আর সম্পদ মানুষকে দুনিয়ার দিকে ধাবিত করে।

১০. সম্পদশালী মৃত্যুকে অপসন্দ করে আর আলেম আল্লাহর সাক্ষাতের আশা করে।

(৭) দ্বীনি ক্ষতি থেকে বাঁচায়: দুনিয়া ও আখেরাতে ক্ষতি থেকে বাচার জন্য সূরা আছরে আল্লাহ চারটি গুণের কথা বলেছেন। তন্মধ্যে ঈমান তথা ইলম হল প্রথম। মহান আল্লাহ বলেন,

وَ الْعَصْرِ -اِنَّ الْاِنْسَانَ لَفِیْ خُسْرٍ-اِلَّا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا وَ عَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَ تَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَ تَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ ۧ

‘নিশ্চয় সকল মানুষ অবশ্যই ক্ষতির মধ্যে রয়েছে। তারা ব্যতীত যারা (জেনে-বুঝে) ঈমান এনেছে ও সৎকর্ম সম্পাদন করেছে এবং পরস্পরকে ‘হক’-এর উপদেশ দিয়েছে ও পরস্পরকে ধৈর্যের উপদেশ দিয়েছে’ (সূরা আল-আছর: ২-৩)। মূলত জানার নামই ঈমান। আর ঈমানের পূর্ব শর্ত হল ইলম (সূরা মুহাম্মাদ: ১৯)। তদুপরি

দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণের জন্য ইলমের প্রয়োজন। ইমাম শাফেঈ (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন,

من أراد الدنيا فعليه بالعلم ومن أراد الآخرة فعليه بالعلم ومن أرادهما معا فعليه بالعلم أيضا

‘যে দুনিয়া চায় তার জন্য ইলম অর্জন করা যরূরী, যে আখেরাত চায় তার জন্যও ইলম অর্জন করা যরূরী। আর যে (দুনিয়া ও আখিরাত) উভয়টিই চায় তার জন্যও ইলম অর্জন করা যরূরী’।[২১]

(৮) দ্বীনি শিক্ষার কারণে বান্দা রিযিক প্রাপ্ত হয়: আনাস ইবনু মালিক (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম (ﷺ)-এর যুগে দুই ভাই ছিল। তাদের একজন রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর দরবারে উপস্থিত থাকত এবং অন্যজন আয়-উপার্জনে লিপ্ত থাকত। একদিন রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর নিকট সেই উপার্জনকারী ভাই তার ভাইয়ের বিরুদ্ধে অভিযোগ করল। তিনি তাকে বললেন,لَعَلَّكَ تُرْزَقُ بِهِ ‘হয়তো তার অসীলায় তুমি রিযিকপ্রাপ্ত হচ্ছ’।[২২]

(৯) দ্বীনি শিক্ষা আল্লাহর পক্ষ থেকে নে‘মত: আল্লাহর পক্ষ থেকে বিশেষ নে‘মত হল ইলম। মহান আল্লাহ তাঁর রাসূলকে লক্ষ্য করে বলেন,

وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُن تَعْلَمُ ۚ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا

‘আর আল্লাহ তোমার উপর কিতাব ও সুন্নাহ অবতীর্ণ করেছেন এবং তোমাকে শিক্ষা দিয়েছেন যা তুমি জানতে না। বস্তুত তোমার উপর আল্লাহর করুণা অসীম’ (সূরা আন-নিসা: ১১৩)।

আর যাকে এই ইলম দেয়া হয়েছে তাকেই মূলত কল্যাণ দেয়া হয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন,

ۗ يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَن يَشَاءُ ۚ وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا

‘আল্লাহ যাকে ইচ্ছা বিশেষ প্রজ্ঞা দান করেন। আর যাকে উক্ত প্রজ্ঞা দান করা হয়, তাকে প্রভূত কল্যাণ দান করা হয়’ (সূরা আল-বাক্বারাহ: ২৬৯)।

আল্লাহ ইলমের মত নে‘মত তাঁর প্রিয় বান্দা তথা নবী-রাসূলদেরকে দিয়েছেন। যেমন- ইউসুফ (আলাইহিস সালাম) (সূরা ইউসুফ: ২২), মূসা (আলাইহিস সালাম) (সূরা আল-ক্বাছাছ: ১৪), ঈসা (আলাইহিস সালাম) (সূরা আল-মায়েদাহ: ১১০), দাঊদ (আলাইহিস সালাম) (সূরা ছোয়াদ: ২০), সুলায়মান (আলাইহিস সালাম) (সূরা আল-আম্বিয়া: ৭৯; সূরা নামল: ১৫)।

(১০) আলেমগণ হলেন নবীদের উত্তরসূরি: নবীগণ কোন স্বর্ণ বা রৌপ্যমুদ্রা উত্তরাধিকার সূত্রে রেখে যাননি; তাঁরা উত্তরাধিকার সূত্রে রেখে গেছেন শুধু ইলম। নবী (ﷺ) বলেন,

وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الأَنْبِيَاءِ وَإِنَّ الأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوْا دِيْنَارًا وَلَا دِرْهَمًا وَإِنَّمَا وَرَّثُوا الْعِلْمَ فَمَنْ أَخَذَهُ أَخَذَ بِحَظٍّ وَافِرٍ

‘উলামা সম্প্রদায় পয়গম্বরদের উত্তরাধিকারী। আর এ কথা সুনিশ্চিত যে, পয়গম্বরগণ কোন রৌপ্য বা স্বর্ণ মুদ্রার কাউকে উত্তরাধিকারী বানিয়ে যাননি; বরং তাঁরা ইলমের (দ্বীনী জ্ঞানভাণ্ডারের) উত্তরাধিকারী বানিয়ে গেছেন। সুতরাং যে ব্যক্তি তা অর্জন করল, সে পর্যাপ্ত অংশ লাভ করল’।[২৩]

তাই আসুন! আমরা মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের নৈকট্য হাসিলের চেতনা নিয়ে দ্বীনী জ্ঞান নিজে অর্জন করি এবং আমাদের সন্তানদের দ্বীনী শিক্ষায় শিক্ষিত করি। মহান আল্লাহ রব্বুল আলামীন আমাদেরকে নেক তাওফীক দান করুন। আমীন!

তথ্যসূত্র :

[১]. তারীখে তাবারী, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ৫৭২।
[২]. ফাতাওয়াউল ইসলাম সাওয়াল ওয়া জাওয়াব, ফৎওয়া নং-৪৭২৭৩।

[৩]. ইবনু মাজাহ, হা/২২৪।

[৪]. ছহীহ বুখারী, হা/৭১; ছহীহ মুসলিম, হা/১০৩৭।

[৫]. ছহীহ বুখারী, হা/৭৩; ছহীহ মুসলিম, হা/৮১৬।

[৬]. ছহীহ মুসলিম, হা/২৬৯৯।

[৭]. ত্বাবারানী, আল-মু'জামুল কাবীর, হা/৭৩৪৭; মাজমাউয যাওয়ায়েদ, হা/৫৫০।

[৮]. তিরিমিযী, হা/২৬৪৭।

[৯]. ইবনু মাজাহ, হা/২২৭; মুসনাদে আহমাদ, হা/৯৪১৯।

[১০]. ছহীহ মুসলিম, হা/১৬৩১।

[১১]. ছহীহ বুখারী, হা/৫০২৭।

[১২]. তিরমিযী, হা/২১৫৫; সিলসিলা ছহীহাহ, হা/১৩৩।

[১৩]. হাকেম, আল-মুসতাদরাক আলাছ ছহীহাইন, হা/৩৬০; দারেমী, হা/৪৯৮।

[১৪]. ছহীহ বুখারী, হা/১১৩।

[১৫]. ছহীহ বুখারী, হা/১১২।

[১৬]. সূরা আয-যুমার: ২; মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব, তাফসীরুল কুরআন, সূরা আছর ৩ নং আয়াতের তাফসীর দ্র.।

[১৭]. শারহু রিয়াযিছ ছালেহীন, ৫ম খণ্ড, পৃ. ৪১৩-৪১৪।

[১৮]. মিফতাহু দারিস সা'আদাহ, পৃ. ২।

[১৯]. ফাযলুল ইলম ওয়াল ওলামা, পৃ. ১৫৬; ইবনে আসাকির, তারীখে দিমাশক, ৫০শ খণ্ড, পৃ. ৫৭১; ইমাম গাযযালী, ইহইয়া উলূমুদ্দীন, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৭-১৮।

[২০]. ফাযলুল ইলম ওয়াল ওলামা, পৃ. ৯-২২৪।

[২১].https://marj3y.com/صحة-من-أراد-الدنيا-فعليه-بالعلم-ومن-أرا/) ।

[২২]. ছহীহ বুখারী, হা/৬১।

[২৩]. আবূ দাঊদ, হা/৩৬৪৩; তিরমিযী, হা/২৬৮২; ইবনু মাজাহ, হা/২২৩।

■ ইলম অন্বেষণের ফযীলত ও মর্যাদা:

আমাদের এই মহান ধর্মে ইলমকে অনেক মর্যাদা দেয়া হয়েছে। ইলমের ধারক-বাহকরা নবী-রাসূলদের উত্তরাধিকারী। আর আবেদ ও আলেমের মর্যাদার ফারাক আসমান ও যমীনের মতো। কায়স ইবন কাছীর থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

قَدِمَ رَجُلٌ مِنَ الْمَدِينَةِ عَلَى أَبِي الدَّرْدَاءِ ، وَهُوَ بِدِمَشْقَ فَقَالَ :مَا أَقْدَمَكَ يَا أَخِي ؟ فَقَالَ حَدِيثٌ بَلَغَنِي أَنَّكَ تُحَدِّثُهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ :أَمَا جِئْتَ لِحَاجَةٍ ؟ قَالَ :لا ، قَالَ :أَمَا قَدِمْتَ لِحِجَارَةٍ ؟ قَالَ : لا ، قَالَ :مَا جِئْتُ إِلَّا فِي طَلَبِ هَذَا الحَدِيثِ ؟ قَالَ :فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ :مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَبْتَغِي فِيهِ عِلْمًا سَلَكَ اللهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ ، وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا رِضَاء لِطَالِبِ العِلْمِ ، وَإِنَّ العَالِمَ لَيَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الأَرْضِ حَتَّى الحِيتَانُ فِي الْمَاءِ ، وَفَضْلُ العَالِمِ عَلَى العَابِدِ ، كَفَضْلِ القَمَرِ عَلَى سَائِرِالكَوَاكِبِ ، إِنَّ العُلَمَاءَ وَرَثَةُ الأَنْبِيَاءِ ، إِنَّ الأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا إِنَّمَا وَرَّثُوا العِلْمَ ، فَمَنْ أَخَذَ بِهِ أَخَذَ بِحَظٍّ وَافِرٍ.

মদীনা থেকে এক ব্যক্তি দামেশকে আবু দারদা রাদিআল্লাহু আনহুর কাছে এলো। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, হে ভাই, কোন জিনিস এখানে তোমার আগমন ঘটিয়েছে?

তিনি বললেন: একটি হাদীস এখানে আমাকে এনেছে, যা আপনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন বলে আমার কাছে সংবাদ পৌঁছেছে।

তিনি জানতে চাইলেন: তুমি কি অন্য কোনো প্রয়োজনে আসো নি ?! তিনি বললেন, না।

জানতে চাইলেন: তুমি কি বাণিজ্যের জন্যে আসো নি?! উত্তর দিলেন, জ্বি না।

তিনি জানালেন, আমি কেবল এ হাদীস শিখতেই আপনার কাছে এসেছি।

তিনি বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, 'যে ব্যক্তি ইলম হাসিলের উদ্দেশ্যে কোনো পথ অবলম্বন করে আল্লাহ তার জান্নাতের পথ সহজ করে দেন। আর তালিবুল ইলমকে খুশি করতে ফেরেশতারা তাঁদের ডানা বিছিয়ে দেন। আলেমের জন্য আসমান ও যমীনের সবাই মাগফিরাত কামনা করতে থাকে। এমনকি পানির মাছগুলো পর্যন্ত। আর আবেদের ওপর আলেমের শ্রেষ্ঠত্ব সকল তারকার ওপর চাঁদের শ্রেষ্ঠত্বের মতো। নিশ্চয় আলেমগণ নবীদের উত্তরাধিকারী। তবে নবীগণ দিনার বা দিরহামের উত্তরাধিকারী বানান না। তাঁরা কেবল ইলমের ওয়ারিশ বানান। অতএব যে তা গ্রহণ করে সে পূর্ণ অংশই পায়।' [তিরমিযী: ২৬৮২]

আর আলেমগণ হলেন বান্দাদের জন্য আল্লাহর বিশেষ রক্ষী। কারণ তাঁরা শরীয়তকে ভ্রান্তপন্থীদের বিকৃতি ও অজ্ঞদের অপব্যাখ্যা থেকে রক্ষা করেন। আলেমদের জন্য এ এক বিশাল মর্যাদার ব্যাপার। দীনের ব্যাপারে তাঁদের কাছেই ছুটে যেতে হয়। হতে হয় তাঁদেরই শরণাপন্ন। কেননা আল্লাহ তা'আলা অজ্ঞদের জন্য আবশ্যক করে দিয়েছেন তাঁদের কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করা। তিনি ইরশাদ করেন,

فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ]النحل :٤٣[

'সুতরাং জ্ঞানীদের জিজ্ঞেস কর যদি তোমরা না জান'। (সূরা আন-নাহল, আয়াত: ৪৩) আর প্রকৃতপক্ষে তাঁরা মানুষের চিকিৎসক। কেননা দেহের রোগের চেয়ে আত্মার ব্যাধিই বেশি। কারণ, মূর্খতা একটি রোগ আর এই রোগগুলোর ওষুধ হলো এই ইলম। যেমন : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

فَإِنَّمَا شِفَاءُ الْعِيِّ السُّؤَالُ ..

'নিশ্চয় অজ্ঞতার চিকিৎসা হলো জিজ্ঞাসা'। [আবু দাউদ: ৩৩৬]

প্রথম: ইলমের মর্যাদা:

১. ইলম অন্তরকে পরিশুদ্ধ করে:

সুফিয়ান ইবন উয়াইনা রহ.- কে ইলমের ফযীলত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলো। তিনি বললেন, তোমরা কি আল্লাহর এ বাণীর প্রতি লক্ষ্য করো নি? এতে তিনি ইলম হাসিলের পর আমলের কথা বলেছেন। ইরশাদ হয়েছে:

فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَنَكُمْ]محمد :١٩[

'অতএব জেনে রাখ, নিঃসন্দেহে আল্লাহ ছাড়া কোনো (সত্য) ইলাহ নেই। তুমি ক্ষমা চাও তোমার ও মুমিন নারী-পুরুষদের ত্রুটি-বিচ্যুতির জন্য। আল্লাহ তোমাদের গতিবিধি এবং নিবাস সম্পর্কে অবগত রয়েছেন। {সূরা মুহাম্মদ, আয়াত: ১৯}
এ আয়াতে আগে ইলম তথা জানার কথা বলা হয়েছে। তারপর বলা হয়েছে আমলের (ক্ষমা চাওয়ার) কথা। এই আয়াতকে সামনে রেখে ইমাম বুখারী রহ. তদীয় সহীহ গ্রন্থের একটি অধ্যায় রচনা করেছেন এমন শিরোনামে এ অধ্যায় 'বলা ও করার আগে শেখা সম্পর্কে'। অতএব কথা ও কর্মের আগে ইলম অর্জনের অগ্রাধিকার। কারণ ইলম ছাড়া কোনো আমল শুদ্ধ হয় না। আর প্রথমেই শিখতে হবে তাওহীদ তথা আল্লাহর নিরঙ্কুশ একাত্ববাদের ইলম। একে বলা হয় সুলুকের ইলম। যাতে করে আল্লাহর পরিচয় লাভ হয়। আকীদা শুদ্ধ করা যায়। নিজেকে চেনা যায় এবং কিভাবে নিজেকে বিশুদ্ধ ও পরিশুদ্ধ করা যায় তাও জানা যায়।

২. ইলম দৃষ্টির আলো:

ইলম দৃষ্টির আলো। যা দিয়ে মানুষ বস্তুর হাকিকত ও বাস্তবতা অনুধাবন করতে পারে। তবে এ কিন্তু চোখের দৃষ্টি নয়; এ হলো অন্তরের দৃষ্টি। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ ءَاذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَرُ وَلَكِن تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ]الحج :٤٦[

স'তারা কি যমীনে ভ্রমণ করে নি? তাহলে তাদের হত এমন হৃদয় যা দ্বারা তারা উপলব্ধি করতে পারত এবং এমন কান যা দ্বারা তারা শুনতে পারত। বস্তুত চোখ তো অন্ধ হয় না, বরং অন্ধ হয় বক্ষস্থিত হৃদয় (সূরা আল-হজ্ব, আয়াত: ৪৬}

এ জন্যই আল্লাহ তা'আলা মানুষকে দুই ভাগে বিভক্ত করেছেন: আলেম ও অন্ধ। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন,

أَفَمَن يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَىٰ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُوْلُوا الْأَلْبَابِ]الرعد: ١٩]

যে ব্যক্তি জানে তোমার রবের পক্ষ থেকে তোমার প্রতি যা নাযিল হয়েছে, তা সত্য, সে কি তার মত, যে অন্ধ? বুদ্ধিমানরাই শুধু উপদেশ গ্রহণ করে। {সূরা আর-রাদ, আয়াত: ১৯}

৩. ইলম মানুষের অন্তরে আল্লাহ ভয় সৃষ্টি করে:

যেমন আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন,إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَؤُا إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ]فاطر :٢٨]

বান্দাদের মধ্যে কেবল জ্ঞানীরাই আল্লাহকে ভয় করে। নিশ্চয় আল্লাহ মহাপরাক্রমশালী, পরম ক্ষমাশীল। {সূরা ফাতির, আয়াত: ২৮}
আরেক আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

إِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مِن قَبْلِهِ إِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ يَخِرُونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّدًا وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا إِن كَانَ وَعْدُ رَبَّنَا لَمَفْعُولًا وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ و شوعاء]الاسراء :١٠٧، ١٠٩]

'নিশ্চয় এর পূর্বে যাদেরকে জ্ঞান দেয়া হয়েছে, তাদের কাছে যখন এটা পাঠ করা হয় তখন তারা সিজদাবনত হয়ে লুটিয়ে পড়ে। আর তারা বলে, 'পবিত্র মহান আমাদের

রব! আমাদের রবের ওয়াদা অবশ্যই কার্যকর হয়ে থাকে। আর তারা কাঁদতে কাঁদতে লুটিয়ে পড়ে এবং এটা তাদের বিনয় বৃদ্ধি করে। (সূরা বনী ইসরাঈল, আয়াত: ১০৭-১০৯}

৪. ইলম বৃদ্ধির জন্য দু'আ করা:

আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে ইলম বৃদ্ধির জন্য প্রার্থনা করতে বলেছেন। ইলমের মর্যাদা হিসেবে এতটুকুই যথেষ্ট। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَقُل رَّبِّ زِدْنِي عِلْمًا]طه :١١٤[

'এবং তুমি বল, 'হে আমার রব, আমার জ্ঞান বৃদ্ধি করে দিন।' (সূরা ত্ব-হা, আয়াত: ১১৪) ইমাম কুরতুবী রহ. বলেন, যদি ইলম থেকে উত্তম কিছু থাকত তবে আল্লাহ তাঁর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তা-ই বৃদ্ধির প্রার্থনা করতে বলতেন। যেমন তিনি এ আয়াতে ইলম বৃদ্ধির জন্য প্রার্থনা করতে বলেছেন।

৫. ইলম উত্তম জিহাদ:

জিহাদের একটি প্রকার হলো প্রমাণ ও দলীলের মাধ্যমে জিহাদ করা।

এটিই নবীর উত্তরাধিকারী নেতৃবৃন্দের জিহাদ। মুখ ও হাতের জিহাদ থেকে এটি উত্তম। কারণ ইলম অর্জনে বেশি কষ্ট করতে হয় এবং এর শত্রুও বেশি। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيرًا *فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُم بِهِ جِهَادًا كبيرًا
[الفرقان :٥١، ٥٢]

'আর আমি ইচ্ছা করলে প্রতিটি জনপদে একজন সতর্ককারী পাঠাতাম।

সুতরাং তুমি কাফিরদের আনুগত্য করো না এবং তুমি কুরআনের সাহায্যে তাদের বিরুদ্ধে কঠোর সংগ্রাম (জিহাদ) কর।' {সূরা আল-ফুরকার, আয়াত: ৫১-৫২}

ইবনুল কায়্যিম রহ. বলেন,

فهذا جهاد لهم بالقرآن ، وهو أكبر الجهادين ، وهو جهاد المنافقين أيضًا ، فإن المنافقين لم يكونوا يقاتلون المسلمين ، بل كانوا معهم في الظاهر ، وربما كانوا يقاتلون عدوهم معهم ، ومع هذا فقد قال تعالى " :يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم "ومعلوم أن جهاد المنافقين بالحجة والقرآن والمقصود أن سبيل الله هي الجهاد وطلب العلم ، ودعوة الخلق به إلى الله ".

'এটি ছিল তাদের বিরুদ্ধে কুরআনের সাহায্যে জিহাদ। জিহাদের প্রকারদ্বয়ের মধ্যে এটিই বড়। একে মুনাফিকদের বিরুদ্ধের জিহাদও বলা হয়। কারণ মুনাফিকরা মুসলিমদের বিরুদ্ধে লড়াই করত না। তারা বরং দৃশ্যত মুসলিমদের সঙ্গেই থাকত। কখনো তারা মুসলিমের সঙ্গে শত্রুদের বিরুদ্ধে লড়াইয়েই শরিক হত। এতদসত্ত্বেও আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ جَٰهِدِ ٱلْكُفَّارَ وَٱلْمُنَٰفِقِينَ وَٱغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَمَأْوَىٰهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ ٱلْمَصِيرُ
[التحريم :٩]

'হে নবী, কাফির ও মুনাফিকদের বিরুদ্ধে জিহাদ কর এবং তাদের ব্যাপারে কঠোর হও; আর তাদের আশ্রয়স্থল হবে জাহান্নাম এবং তা কত নিকৃষ্ট গন্তব্যস্থল। (সূরা আত-তাহরীম, আয়াত: ০৯)
আর বলাবাহুল্য, মুনাফিকদের বিরুদ্ধে জিহাদ করা হয় কুরআন ও প্রমাণের মাধ্যমে।

উদ্দেশ্য হলো, জিহাদ, ইলম অর্জন এবং মানুষকে আল্লাহর পথে আহ্বান- সবগুলোই সাবিলুল্লাহ বা আল্লাহর রাস্তা। [দেখুন, ইবনুল কায়্যিম, মিফতাহু দারিস সাআদা: ১/৭০]

আবু হুরায়রা রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

مَنْ جَاءَ مَسْجِدِي هَذَا ، لَمْ يَأْتِهِ إِلَّا لِخَيْرٍ يَتَعَلَّمُهُ أَوْ يُعَلِّمُهُ ، فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللهِ ، وَمَنْ جَاءَ لِغَيْرِ ذَلِكَ ، فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الرَّجُلِ يَنْظُرُ إِلَى مَتَاعِ غَيْرِهِ. ».

'যে ব্যক্তি আমার এই মসজিদে কেবল কোনো কল্যাণ (ইলম) শেখার বা শেখাবার অভিপ্রায়ে আসবে, সে আল্লাহর রাস্তায় মুজাহিদের মর্যাদার অধিকারী। আর যে অন্য কোনো উদ্দেশ্য নিয়ে আসবে, সে ওই ব্যক্তির অনুরূপ যে অন্যের সম্পদ পরিদর্শনে আসে। [ইবন মাজা: ২২৭, সহীহ সনদে বর্ণিত]

৬. ইলম প্রচারে প্রতিযোগিতা:

আল্লাহ তা'আলা কেবল দু'টি বিষয়ে পরস্পর হিংসা (ইর্ষা) পোষণ বৈধ রেখেছেন: সম্পদ ব্যয় এবং ইলম ব্যয়। এটি করা হয়েছে এ দুই জিনিসের মর্যাদা হেতু। আর মানুষকে নানা ধরনের কল্যাণ আহরণে পরস্পর প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হতে উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে। যেমন: আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ রাদিআল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

لا حَسَدَ إِلَّا فِي اثْنَتَيْنِ :رَجُلٌ أَعْطَاهُ اللهُ مَالاً فَسَلَّطَهُ عَلَى هَلَكَتِهِ فِي الْحَقِّ ، وَرَجُلٌ آتَاهُ اللهُ الْحِكْمَةَ فَهُوَ يَقْضِي بِهَا وَيُعَلِّمُهَا » .

'কেবল দুই ব্যক্তিকে হিংসা করার অনুমতি রয়েছে: ওই ব্যক্তিকে আল্লাহ যাকে সম্পদ দিয়েছেন। অতপর তাকে সে সম্পদ হকের পথে ব্যয় করতে ন্যস্ত করেছেন। আর ওই ব্যক্তি যাকে তিনি হিকমাহ বা ইলম দান করেছেন। ফলে সে তা দিয়ে বিচার করে এবং তার শিক্ষা দেয়।' [বুখারী: ৭৩]

৭. ইলম ও দীন সম্পর্কে পাণ্ডিত্য আল্লাহর মহাদান:

আল্লাহ যাকে দীন সম্পর্কে গভীর জ্ঞান দান করেন তিনিই প্রকৃত তাওফীকপ্রাপ্ত। কেননা দীনী বিষয়ে প্রাজ্ঞতা ও পাণ্ডিত্য আল্লাহর এক মহাদান। মু'আবিয়া ইবন সুফিয়ান রাদিআল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

« مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ.

'আল্লাহ যার কল্যাণ চান তিনি তাকে দীন বিষয়ে গভীর ইলম দান

করেন।' [বুখারী: ৭৩১২; মুসলিম: ২৪৩৯]

৮. ইবাদতের চেয়ে ইলমের মর্যাদা বেশি:

ইবাদতের চেয়ে ইলমের গুরুত্ব বেশি। কারণ, ইলমের মর্যাদার হেতুগুলো একটি হলো তা ইবাদতের প্রতি ধাবিত করে। আর যে ইলম হাসিলে পথ অতিক্রম করে তার জন্য জান্নাতের পথ সহজ হয়ে যায়। মা আয়েশা রাদিআল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ :أَوْحَى إِلَيَّ أَنَّهُ مَنْ سَلَكَ مَسْلَكًا فِي طَلَبِ الْعِلْمِ :سَهَّلْتُ لَهُ طَرِيقَ الْجَنَّةِ، وَمَنْ سَلَبْتُ كَرِيمَتَيْهِ :أَثَبْتُهُ عَلَيْهِمَا الْجَنَّةَ، وَقَصْدُ فِي عِلْمٍ خَيْرٌ مِنْ فَضْلٍ فِي عِبَادَةٍ وَمِلَاكُ الدِّينِ الْوَرَعُ ..

'আল্লাহ আমার প্রতি ওহী করেছেন, যে ব্যক্তি ইলম অর্জনে কোনো রাস্তা অবলম্বন করে, আমি তার জান্নাতের রাস্তা সহজ করে দেই। আর আমি যার দুই প্রিয়তমকে (চক্ষুদ্বয়) কেড়ে নেই, এর বিনিময়ে আমি তাকে জান্নাত দান করি। কল্যাণের ইলম আহরণে আধিক্য ইবাদতেও আধিক্যের হেতু। দীনের সেরা বিষয় হলো আল্লাহর ভয়।' [বাইহাকী, শু'আবুল ঈমান: ৫৩৬৭, সহীহ সনদে বর্ণিত]

দ্বিতীয়: আলেমের মর্যাদা

১.আলেমরাই বিশ্বস্ত:

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন,

شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُوا الْعِلْمِ قَائِمًا
بِالْقِسْطِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ
الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ]آل عمران :١٨[

'আল্লাহ সাক্ষ্য দেন যে, তিনি ছাড়া কোনো (সত্য) ইলাহ নেই, আর ফেরেশতা ও জ্ঞানীগণও। তিনি ন্যায় দ্বারা প্রতিষ্ঠিত। তিনি ছাড়া কোনো (সত্য) ইলাহ নেই। তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়'। (সূরা আলে-ইমরান,আয়াত: ১৮)

এ থেকে জানা গেল, আলেমরা হলেন বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য। যাদেরকে আল্লাহ তা'আলা সবচে বড় সমাবেশে (হাশরের মাঠে) সাক্ষ্য বানাবেন।

২. আলেমদের প্রশংসায় আল্লাহ:

আল্লাহ তা'আলা আহলে ইলম তথা আলেমদের প্রশংসা ও গুণ গেয়েছেন। তাঁর কিতাবকে তিনি তাঁদের বক্ষে সুস্পষ্ট নিদর্শন হিসেবে স্থান দিয়েছেন। এর মাধ্যমে অন্তর পুলকিত হয়, আমোদিত ও সৌভাগ্যমণ্ডিত হয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

بَلْ هُوَ وَايَتٌ بَيِّنَتٌ فِي صُدُورِ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَمَا يَجْحَدُ بِنَايَاتِنَا إِلَّا الظَّالِمُونَ

[العنكبوت :٤٩]

'বরং যাদেরকে জ্ঞান দেয়া হয়েছে, তাদের অন্তরে তা সুস্পষ্ট নিদর্শন। আর যালিমরা ছাড়া আমার আয়াতসমূহকে কেউ অস্বীকার করে না'। {সূরা আল-আ'নকাবুত, আয়াত: ৪৯}

৩. আলেমরা নবীগণের ওয়ারিশ:

তাঁরাই হলেন 'আহলে যিকর' আল্লাহ তা'আলা অজ্ঞতায় যাদের কাছে

জিজ্ঞেস করতে বলেছেন। তিনি ইরশাদ করেন,

فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾]الانبياء :٧[

'সুতরাং তোমরা জ্ঞানীদেরকে জিজ্ঞাসা কর যদি তোমরা না জান'। (সূরা

আল-আম্বিয়া, আয়াত: ০৭}

৪. ঈমান ও ইলমের বাহকদের মর্যাদা বৃদ্ধি:

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন,

يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ
[المجادلة :١١]

'তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছে এবং যাদেরকে জ্ঞান দান করা হয়েছে আল্লাহ তাদেরকে মর্যাদায় সমুন্নত করবেন'। (সূরা আল-মুজাদালাহ, আয়াত: ১১)

৫. মারা গেলেও আলেমের আমল বন্ধ হয় না:

মানুষ বেঁচে থাকে এবং তারপর মারা যায়। মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে তার আমলও বন্ধ হয়ে যায়। ব্যতিক্রম শুধু আলেমরা। যে আল্লাহওয়ালা আলেম উপকারী ইলম প্রচার করে মৃত্যুবরণ করেন, তিনি মারা গেলে পরবর্তী লোকেরা তাঁর ইলম থেকে উপকৃত হয় আর তিনি নেকী পেতে থাকেন। ইখলাসের সঙ্গে কাজ করলে তাই তাঁদের নেকী বহুগুণে বৃদ্ধি পায়। পরবর্তী নিবন্ধে ইনশাআল্লাহ এ ব্যাপারে আমরা বিস্তারিত

আলোচনা করব। আবু হুরায়রা রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

إِذَا مَاتَ الإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةِ أَشْيَاءَ :مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ ».

'মানুষ যখন মারা যায়, তখন তার আমল বন্ধ হয়ে যায়। তবে তিনটি উৎস থেকে তা অব্যাহত থাকে সাদাকায়ে জারিয়া, উপকারী ইলম অথবা নেক সন্তান যে তার জন্য দু'আ কর।' [মুসলিম: ৪৩১০]

৬. আলেম ও তালেবে ইলমের প্রতি আল্লাহর অবিরাম রহমত বর্ষণ:

পৃথিবীর সব কিছুই ধ্বংসে নিপতিত, সবই বিলয়ের পথে ধাবমান। সব কিছুর ওপরই লানতের বর্ষণ অব্যাহত রয়েছে। সব কিছুর মধ্যে কেবল মানুষের দুইটি শ্রেণী ব্যতিক্রম যাদের ওপর আল্লাহর রহমত বর্ষিত হতে থাকে: ইলমসম্পন্ন ব্যক্তি ও ইলম অন্বেষণকারী এবং অধিক হারে আল্লাহর জিকিরকারী আবেদ। যেমন আবু হুরায়রা রাদিআল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

« أَلَا إِنَّ الدُّنْيَا مَلْعُونَةٌ ، مَلْعُونٌ مَا فِيهَا ، إلا ذِكْرَ اللهِ تَعَالَى ، وَمَا وَالاهُ ، وَعَالِماً وَمُتَعَلِّماً ..

'মনে রেখ, নিশ্চয় দুনিয়া অভিশপ্ত। অভিশপ্ত এতে যা আছে তা-ও। শুধু আল্লাহ তা'আলার জিকির ও জিকিরের প্রয়োজনীয় বিষয়গুলো এবং আলেম ও তালেবে এলেম ছাড়া।' [তিরমিযী: ২৩২২; ইবন মাজা: ৪১০২]

৭. ইলমের কারণে আমলকারীর প্রতিদান বাড়ে:

ইলমের দ্বারা মুমিনের প্রতিদান বড় হয়। তার নিয়ত হয় পরিশুদ্ধ। ফলে সে নিজ আমল করতে পারে সুন্দর উপায়ে। মানুষ ইলমের চেয়ে মালের

قال الترمذي :حَدِيثٌ حَسَن وهكذا قال الألباني .

প্রতি বেশি আকৃষ্ট হয়। অথচ মালের চেয়ে ইলমের মর্যাদা অনেক বেশি। এ ব্যাপারে শরীয়ত আমাদেরকে কয়েকটি শ্রেণীতে বিভক্ত করেছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মানুষকে চার ভাগে বিভক্ত করেছেন। এদের মধ্যে দুই দল হবে নাজাত বা মুক্তিপ্রাপ্ত। তারা হলেন যারা ইলম নিয়ে ব্যস্ত থাকেন। যেমন কাবশা রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেন,

ثَلاَثَةٌ أُقْسِمُ عَلَيْهِنَّ وَأُحَدِّثُكُمْ حَدِيثًا فَاحْفَظُوهُ « .قَالَ » مَا نَقَصَ مَالُ عَبْدٍ مِنْ صَدَقَةٍ وَلَا ظُلِمَ عَبْدُ مَظْلِمَةً فَصَبَرَ عَلَيْهَا إِلَّا زَادَهُ اللَّهُ عِيًّا وَلَا فَتَحَ عَبْدُ بَابَ مَسْأَلَةٍ إِلا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ بَابَ فَقْرٍ أَوْ كَلِمَةً نَحْوَهَا وَأُحَدِّثُكُمْ حَدِيثًا فَاحْفَظُوهُ قَالَ » إِنَّمَا الدُّنْيَا لأَرْبَعَةِ نَفَرٍ عَبْدٍ رَزَقَهُ اللَّهُ مَالاً وَعِلْمًا فَهُوَ يَتَّقِي فِيهِ رَبَّهُ وَيَصِلُ فِيهِ رَحِمَهُ وَيَعْلَمُ لِلَّهِ فِيهِ حَقًّا فَهَذَا بِأَفْضَلِ الْمَنَازِلِ وَعَبْدٍ رَزَقَهُ اللَّهُ عِلْمًا وَلَمْ يَرْزُقْهُ مَالاً فَهُوَ صَادِقُ النِّيَّةِ يَقُولُ لَوْ أَنَّ لِي مَالاً لَعَمِلْتُ بِعَمَلِ فُلاَنٍ فَهُوَ بِنِيَّتِهِ فَأَجْرُهُمَا سَوَاءٌ وَعَبْدٍ رَزَقَهُ اللَّهُ مَالاً وَلَمْ يَرْزُقْهُ عِلْمًا فَهُوَ يَخْبِطُ فِي مَالِهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ لَا يَتَّقِي فِيهِ رَبَّهُ وَلَا يَصِلُ فِيهِ رَحِمَهُ وَلَا يَعْلَمُ لِلَّهِ فِيهِ حَقًّا فَهَذَا بِأَخْبَثِ الْمَنَازِلِ وَعَبْدٍ لَمْ يَرْزُقْهُ اللَّهُ مَالاً وَلَا عِلْمًا فَهُوَ يَقُولُ لَوْ أَنَّ لِي مَالاً لَعَمِلْتُ فِيهِ بِعَمَلِ فُلاَنٍ فَهُوَ بِنِيَّتِهِ فَوِزْرُهُمَا سَوَاءٌ ».

'তিন শ্রেণীর লোকদের ব্যাপারে আমি কসম করছি এবং তোমাদের কাছে একটি হাদীস বলছি, তোমরা তা সংরক্ষণ করো।' তিনি বলেন,
দান-সদকায় কারো সম্পদ কমে না, কোনো ব্যক্তির প্রতি অত্যাচার করা হলে সে যদি তাতে ধৈর্য ধরে তবে আল্লাহ তার সম্মান বৃদ্ধি করে দেন এবং কোনো বান্দা (মানুষের কাছে) প্রার্থনা বা চাওয়ার দরজা খুললে আল্লাহ তার জন্য অভাবের দরজা উন্মুক্ত করে দেন।' (বর্ণনাকারী বলেন, এ কথা কিংবা) অনুরূপ বাক্য বলেছেন। আর আমি তোমাদেরকে একটি হাদীস বলব তোমরা তা স্মরণ রেখ। তিনি বলেন, 'দুনিয়া চার প্রকার লোকের জন্য; (১) সেই বান্দার জন্য যাকে আল্লাহ মাল ও জ্ঞান দান

করেছেন। ফলে সে এতে তার প্রভুকে ভয় করছে এবং তার আত্মীয়দের সঙ্গে সম্পর্ক রাখছে আর তার ব্যাপারে আল্লাহর হক জানছে, এ হলো সর্বোত্তম মর্যাদায় অধিষ্ঠিত। (২) সেই বান্দা যাকে আল্লাহ জ্ঞান দান করেছেন কিন্তু মাল দেন নি। সে হলো সঠিক নিয়তের লোক। সে বলে, যদি আমার টাকা-পয়সা থাকতো তাহলে অমুক ব্যাক্তির মত কাজ করতাম। সে তার নিয়ত অনুযায়ী সওয়াব পাবে। এদের দুজনের নেকী হবে সমান। (৩) আর সেই বান্দা যাকে আল্লাহ টাকা-পয়সা দিয়েছেন কিন্তু জ্ঞান দান করেন নি। সে না জেনেই তার টাকা-পয়সা খরচ করছে। এতে সে আল্লাহকে ভয় করে না, আত্মীয়তা রক্ষা করে না এবং এতে আল্লাহর হকও সে জানে না। সে হলো সবচে নিকৃষ্ট অবস্থানে। (৪) আর সেই বান্দা যাকে আল্লাহ মালও দেন নি জ্ঞানও দেন নি, সে বলে আমার টাকা পয়সা থাকলে অমুকের মতই (খারাপ কাজ) করতাম। সে তার নিয়ত অনুযায়ী প্রতিদান পাবে। এরা দুজনই গুনাহর দিক থেকে সমান।' [তিরমিযী: ২৪৯৫]

হাদীসটিতে আমরা দেখি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রকৃত ইলম বলেছেন ওই ইলমকে যা মানুষের সামনে বস্তুর স্বরূপ উদ্ভাসিত করে। সুতরাং ধন-সম্পদের অধিকারী ব্যক্তি যদি ইলমের শোভায় অলংকৃত না হয় তবে সে সম্পদের অপব্যবহার করে। দেখা যায় সে তা ব্যয় করছে কুপ্রবৃত্তির লালসা পূরণে। এ নেয়ামতের শুকরিয়া আদায় করে না সে। এ কারণেই তাকে সবচে নিকৃষ্ট স্তরের বলে গণ্য করা হয়েছে। (আল্লাহ আমাদের এ থেকে রক্ষা করুন।) পক্ষান্তরে একজন আলেম প্রকৃত সম্পদের মূল্য অনুধাবন করতে পারেন। তা কোথায় ব্যয় করা উচিত তা বুঝতে পারেন। ফলে তাঁর ইলমের বদৌলতে তিনি মহৎ নিয়ত করতে পারেন। সম্পদ না থাকলে তার নিয়ত করেও পারেন সর্বোত্তম মর্যাদা অর্জন করতে।

৮. আলেমের ক্ষমা প্রার্থনা:

ইলমওয়ালাদের মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব বুঝাতে এতটুকুই যথেষ্ট যে আল্লাহ তা'আলা তার জন্য সব কিছুইকে অনুগত করে দেন যাতে তারা তাঁর জন্য দু'আ ও ক্ষমা প্রার্থনা করে। যেমন: আনাস ইবন মালেক

রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

. صَاحِبُ الْعِلْمِ يَسْتَغْفِرُ لَهُ كُلُّ شَيْءٍ حَتَّى الْحُوتُ فِي الْبَحْرِ

'ইলমের অধিকারী ব্যক্তির জন্য সব কিছুই মাগফিরাত বা ক্ষমা প্রার্থনা করে। এমনকি সমুদ্রের মাছ পর্যন্ত।' [সহীহ মুসনাদ আবী ই'আলা : ২/২৬০; সহীহ জামে' সগীর ৩৭৫৩ কানযুল উম্মাল: ২৮৭৩৭]

৯. তালিবুল ইলমদের ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুপারিশ করেছেন:

যেমন আবু সাঈদ খুদরী রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

سَيَأْتِيكُمْ أَقْوَامٌ يَطْلُبُونَ الْعِلْمَ ، فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمْ فَقُولُوا لَهُمْ :مَرْحَبًا مَرْحَبًا بِوَصِيَّةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَاقْنُوهُمْ .

'অচিরে তোমাদের সমীপে ইলম হাসিলের উদ্দেশ্যে নানা দল আসবে। তোমরা যখন তাদের দেখবে, বলবে, স্বাগতম স্বাগতম হে ওই সম্প্রদায়, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যাদের ব্যাপারে সুপারিশ করেছেন। অতপর তোমরা তাদের ইলম শেখাবে।' [ইবন মাজা: ২৪৭, 'হাসান' সূত্রে বর্ণিত]

১০. আলেমদের চেহারা উজ্জ্বল হওয়া এবং তাদের সচ্ছলতা:

আহলে ইলম যারা আল্লাহর দেয়া শরীয়তের জ্ঞান পৌঁছে দেন মানুষের কাছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দু'আ মত তারা হলেন মানুষের মধ্যে সবচে উজ্জ্বল চেহারাবিশিষ্ট এবং তাদের মধ্যে সর্বোচ্চ মর্যাদাবান। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

نَضَّرَ اللَّهُ امْرَءًا سَمِعَ مَقَالَتِي فَبَلَّغَهَا ، فَرُبَّ حَامِلِ فِقْهِ غَيْرِ فَقِيهِ ، وَرُبَّ حَامِلِ فِقْهِ إِلَى مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ ».

'আল্লাহ ওই ব্যক্তির চেহারা উজ্জ্বল (কারো কারো ব্যাখ্যা মতে ওই ব্যক্তিকে সুখে-স্বাচ্ছন্দে) রাখুন যে আমার কথা শোনে অত:পর তা (অপরের কাছে) পৌঁছে দেয়। কেননা, ফিকহ বা ইলমের অনেক বাহক আছে যে (আসলে) ফকীহ বা আলেম (ইসলামী জ্ঞানে পণ্ডিত) নয়। আবার অনেক ফিকহ বা ইলমের বাহক আছেন যিনি তা পৌঁছে দেন এমন ব্যক্তির কাছে যে কি না তার চেয়েও বড় ফিকহবিদ।' [ইবন মাজা : ২৩১, 'সহীহ' সূত্রে
বর্ণিত]

১১. ইলমের মাধ্যমে নবীদের ওপর আল্লাহর অনুগ্রহ:

ইলমের মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্বের অন্যতম নিদর্শন হলো আল্লাহ তা'আলা তাঁর নবী ও রাসূলবর্গকে দেয়া ইলমকে আপন দান ও অনুগ্রহ হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। এ থেকেই এ দানের মাহাত্ম্য অনুমেয়। আমাদের নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি আপন অনুগ্রহ ও দানের কথা বলতে গিয়ে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

{ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُن تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا [النساء :١١٣]

'আর আল্লাহ তোমার প্রতি নাযিল করেছেন কিতাব ও হিকমাত এবং তোমাকে শিক্ষা দিয়েছেন যা তুমি জানতে না। আর তোমার ওপর আল্লাহর অনুগ্রহ রয়েছে মহান। (সূরা আন-নিসা, আয়াত: ১১৩)

আপন বন্ধু ইবরাহীমের প্রতি অনুগ্রহ প্রসঙ্গে বলেন,

إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِلَّهِ حَنِيفًا وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ شَاكِرًا لِأَنْعُمِهِ اجْتَبَاهُ وَهَدَاهُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ] (النحل :١٢٠، ١٢١[

'নিশ্চয় ইবরাহীম ছিলেন এক উম্মত, আল্লাহর একান্ত অনুগত ও একনিষ্ঠ। তিনি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না। সে ছিল তার নিয়ামতের শুকরকারী। তিনি তাকে বাছাই করেছেন এবং তাকে সঠিক পথে পরিচালিত করেছেন।' (সূরা আন-নাহল, আয়াত: ১২০-১২১)

ইউসুফ আলাইহিস সালামের প্রতি অনুগ্রহ প্রসঙ্গে বলেন,

﴿ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاتَيْنَهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ [يوسف: ২২]

'আর সে যখন পূর্ণ যৌবনে উপনীত হল, আমি তাকে হিকমত ও জ্ঞান দান করলাম এবং এভাবেই আমি ইহসানকারীদের প্রতিদান দিয়ে থাকি।' (সূরা ইউসুফ, আয়াত: ২২)

মূসা আলাইহিস সালামের প্রতি অনুগ্রহ প্রসঙ্গে বলেন,

((وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ، وَاسْتَوَى ءَاتَيْنَهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ

[القصص :١٤]

'আর মূসা যখন যৌবনে পদার্পণ করল এবং পরিণত বয়স্ক হলো, তখন আমি তাকে বিচারবুদ্ধি ও জ্ঞান দান করলাম। আর এভাবেই আমি সৎকর্মশীলদের পুরস্কার দিয়ে থাকি।' (সূরা আল-কাসাস, আয়াত: ১৪)

ঈসা ইবন মারইয়াম মাসীহ আলাইহিস সালামের প্রতি অনুগ্রহ প্রসঙ্গে

বলেন,

يَعِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ اذْكُرْ نِعْمَتِي عَلَيْكَ وَعَلَى وَالِدَتِكَ إِذْ أَيَّدتُّكَ بِرُوحِ الْقُدُسِ تُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلاً وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَنَةَ وَالإِنجِيلَ)

[المائدة :١١٠]

'হে মারইয়ামের পুত্র ঈসা, তোমার ওপর ও তোমার মাতার ওপর আমার নি'আমত স্মরণ কর, যখন আমি তোমাকে শক্তিশালী করেছিলাম পবিত্র আত্মা দিয়ে, তুমি মানুষের সাথে কথা বলতে দোলনায় ও পরিণত বয়সে। আর যখন আমি তোমাকে শিক্ষা দিয়েছিলাম কিতাব, হিকমাত, তাওরাত ও ইনজীল।' (সূরা আল-মায়িদা, আয়াত: ১১০)

১২. ইলমের সঙ্গে সম্পৃক্ত হবার মর্যাদা ও সৌভাগ্য:

আলী ইবন আবী তালিব রাদিআল্লাহু আনহু বলেন,

ومن شرف العلم وفضله أن كل من نسب إليه فرح بذلك ، وإن لم يكن من أهله ، وكل من دفع عنه ونسب إلى الجهل عزّ عليه ونال ذلك من نفسه ، وإن كان جاهلاً ..

'ইলমের মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্বের অন্যতম দিক হলো যে-ই এর সঙ্গে সম্পৃক্ত হয় সে এ কারণে আনন্দিত হয়। এমনকি সে যদি ইলমের অধিকারীও না হয়। পক্ষান্তরে যে ইলম থেকে সরে যায় এবং অজ্ঞতায় জড়িয়ে পড়ে তা তার জন্য কষ্টকর মনে হয় এবং এ কারণে সে মর্মপীড়া অনুভব করে। এমনকি সে যদি অজ্ঞও হয়। [জামেউ বায়ানিল ইলম:১/৫৯]

১৩.লোকদের মধ্যে ইলমের অধিকারীগণই সবচে বেশি ভয় করেন আল্লাহকে :

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ كَذَلِكَ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَٰئُوا إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ ﴾]فاطر :٢٨[

'আর এমনিভাবে মানুষ, বিচরণশীল প্রাণী ও চতুষ্পদ জন্তুর মধ্যেও রয়েছে নানা বর্ণ। বান্দাদের মধ্যে কেবল জ্ঞানীরাই আল্লাহকে ভয় করে। নিশ্চয় আল্লাহ মহাপরাক্রমশালী, পরম ক্ষমাশীল। (সূরা ফাতির,আয়াত: ২৮)

অপর আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

إِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مِن قَبْلِهِ إِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ يَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّدًا وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا إِن كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خشوعاء] (الاسراء :١٠٧، ١٠٩]

'নিশ্চয় এর পূর্বে যাদেরকে জ্ঞান দেয়া হয়েছে, তাদের কাছে যখন এটা পাঠ করা হয় তখন তারা সিজদাবনত হয়ে লুটিয়ে পড়ে। আর তারা বলে, 'পবিত্র মহান আমাদের রব! আমাদের রবের ওয়াদা অবশ্যই কার্যকর হয়ে থাকে'। 'আর তারা কাঁদতে কাঁদতে লুটিয়ে পড়ে এবং এটা তাদের বিনয় বৃদ্ধি করে।'। (সূরা বানী ইসরাঈল, আয়াত: ১০৭-১০৯)

১৪.আলেমগণ সেরা মুজাহিদদের অন্যতম:

জিহাদের একটি প্রকার হলো প্রমাণ ও দলীলের মাধ্যমে জিহাদ করা। এটিই নবীর উত্তরাধিকারী নেতৃবৃন্দের জিহাদ। মুখ ও হাতের জিহাদ থেকে এটি উত্তম। কারণ ইলম অর্জনে বেশি কষ্ট করতে হয় এবং এর শত্রুও বেশি। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيرًا *فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُم بِهِ جِهَادًا كبيرًا]الفرقان :٥١، ٥٢[

'আর আমি ইচ্ছা করলে প্রতিটি জনপদে একজন সতর্ককারী পাঠাতাম।সুতরাং তুমি কাফিরদের আনুগত্য করো না এবং তুমি কুরআনের সাহায্যে তাদের বিরুদ্ধে কঠোর সংগ্রাম (জিহাদ) কর।' (সূরা আল-ফুরকার, আয়াত: ৫১-৫২)

ইবনুল কায়্যিম রহ. বলেন,

فهذا جهاد لهم بالقرآن ، وهو أكبر الجهادين ، وهو جهاد المنافقين أيضًا ، فإن المنافقين لم يكونوا يقاتلون المسلمين ، بل كانوا معهم في الظاهر ، وربما كانوا يقاتلون عدوهم معهم ، ومع هذا فقد قال تعالى " :يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم "

ومعلوم أن جهاد المنافقين بالحجة والقرآن والمقصود أن سبيل الله هي الجهاد وطلب العلم ودعوة الخلق به إلى الله ، ".

'এটি ছিল তাদের বিরুদ্ধে কুরআনের সাহায্যে জিহাদ। জিহাদের প্রকারদ্বয়ের মধ্যে এটিই বড়। একে মুনাফিকদের বিরুদ্ধের জিহাদও বলা হয়। কারণ মুনাফিকরা মুসলিমদের বিরুদ্ধে লড়াই করত না। তারা বরং দৃশ্যত মুসলিমদের সঙ্গেই থাকত। কখনো তারা মুসলমানের সঙ্গে শত্রুদের বিরুদ্ধে লড়াইয়েই শরিক হত। এতদসত্ত্বেও আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

يَأَيُّهَا النَّبِيُّ جَهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَمَأْوَنَهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ]التحريم :٩[

'হে নবী, কাফির ও মুনাফিকদের বিরুদ্ধে জিহাদ কর এবং তাদের ব্যাপারে কঠোর হও; আর তাদের আশ্রয়স্থল হবে জাহান্নাম এবং তা কত নিকৃষ্ট গন্তব্যস্থল! (সূরা আত-তাহরীম, আয়াত: ০৯) আর
বলাবাহুল্য, মুনাফিকদের বিরুদ্ধে জিহাদ করা হয় কুরআন ও প্রমাণের মাধ্যমে।

উদ্দেশ্য হলো, জিহাদ, ইলম অর্জন এবং মানুষকে আল্লাহর পথে আহ্বান- সবগুলোই সাবিলুল্লাহ বা আল্লাহর রাস্তা। [দেখুন, ইবনুল কায়্যিম, মিফতাহু দারিস সাআদা: ১/৭০]

আবু হুরায়রা রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

مَنْ جَاءَ مَسْجِدِي هَذَا ، لَمْ يَأْتِهِ إِلَّا لِخَيْرٍ يَتَعَلَّمُهُ أَوْ يُعَلِّمُهُ ، فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللهِ ، وَمَنْ جَاءَ لِغَيْرِ ذَلِكَ ، فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الرَّجُلِ يَنْظُرُ إِلَى مَتَاعِ غَيْرِهِ. ».

'যে ব্যক্তি আমার এই মসজিদে কেবল কোনো কল্যাণ (ইলম) শেখার বা শেখাবার অভিপ্রায়ে আসবে, সে আল্লাহর রাস্তায় মুজাহিদের মর্যাদার অধিকারী। আর যে অন্য

কোনো উদ্দেশ্য নিয়ে আসবে, সে ওই ব্যক্তির অনুরূপ যে অন্যের সম্পদ পরিদর্শনে আসে। [ইবন মাজা: ২২৭, সহীহ সনদে বর্ণিত]

১৫. ইলমের প্রচারেই (ইলম প্রচারে ঐকান্তিক প্রয়াসের কারণেই) আলেমদের মর্যাদা:

আল্লাহ তা'আলা কেবল দু'টি বিষয়ে পরস্পর হিংসা (ইর্ষা) পোষণ বৈধ রেখেছেন: সম্পদ ব্যয় এবং ইলম ব্যয়। আর এটি করা হয়েছে এ দু'টি জিনিসের মর্যাদার কারণে। আর মানুষকে নানা ধরনের কল্যাণ আহরণে পরস্পর প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হতে উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে। যেমন আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ রাদিআল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

لا حَسَدَ إِلَّا فِي اثْنَتَيْنِ :رَجُلٌ أَعْطَاهُ اللهُ مَالاً فَسَلَّطَهُ عَلَى هَلَكَتِهِ فِي الْحَقِّ ، وَرَجُلٌ آتَاهُ اللهُ الْحِكْمَةَ فَهُوَ يَقْضِي بِهَا وَيُعَلِّمُهَا ».

'দুইটি বিষয়ে কেবল হিংসা করার অনুমতি আছে: ওই ব্যক্তিকে আল্লাহ যাকে সম্পদ দিয়েছেন। অতপর তাকে সে সম্পদ হকের পথে ব্যয় করতে ন্যস্ত করেছেন। আর ওই ব্যক্তি যাকে তিনি হিকমাহ বা ইলম দান করেছেন। ফলে সে তা দিয়ে বিচার করে এবং তার শিক্ষা দেয়।'

[বুখারী: ৭৩]

আল্লাহ তা'আলা আমাদের সকলকে যাবতীয় নিষিদ্ধ বিষয় থেকে রক্ষা করুন এবং ইলম, ইলম শেখা ও শেখাতে কষ্ট সহ্য করায় আমাদের উত্তম বিনিময় দান করুন। আমীন।

■ তৃতীয় অধ্যায় ■

■ বলা ও করার পূর্বে জ্ঞান আবশ্যক:

মহা মহিমান্বিত আল্লাহ বলেন : فَاعْلَمْ أَنَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ "সুতরাং জেনে রাখ, আল্লাহ ব্যতীত প্রকৃত কোন উপাস্য নেই।" (সূরা মুহাম্মাদ ৪৭/১৯)।

এখানে আল্লাহ তা'আলা ইলমের কথা আগে বলেছেন। আলিমগণই নবীগণের ওয়ারিস। তারা ইলমের ওয়ারিস হয়েছেন। তাই যে ইলম হাসিল করে সে বিরাট অংশ লাভ করে। আর যে ব্যক্তি ইলম হাসিলের উদ্দেশ্যে পথ চলে, আল্লাহ তা'আলা তার জন্য জান্নাতের পথ সহজ করে দেন। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেনঃ

إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ

আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে আলিমগণই তাকে ভয় করে (সূরা ফাতির ৩৫/২৮)।

আল্লাহ তা'আলা আর ইরশাদ করেনঃ

وَمَا يَعْقِلُهَا إِلاَّ الْعَالِمُونَ "আলিমগণ ছাড়া তা কেউ বুঝেনা"। (সূরা আল-'আনকাবুত ২৯/৩৪)

অন্যত্র ইরশাদ হচ্ছেঃ

وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ তারা বলবে, যদি আমরা শুনতাম অথবা বিবেক-বুদ্ধি প্রয়োগ করতাম, তাহলে আমরা জাহান্নামী হতাম না। (সূরা মুল্ক ৬৭/১০)

অন্যত্র তিনি বলেনঃ

هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لاَ يَعْلَمُونَ "বল, যারা জানে আর যারা জানে না, তারা কি সমান হতে পারে? (সূরা যুমার ৩৯/৯)

নবী কারিম (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেনঃ আল্লাহ যার কল্যাণ চান তাকে দ্বীনের জ্ঞান দান করেন। অধ্যায়নের মাধ্যমেই জ্ঞান অর্জিত হয়। আবু যার (রাঃ)

তাঁর ঘাড়ের দিকে ইশারা করে বলেন, যদি তোমরা এখানে তরবারি ধর, এরপর আমি বুঝতে পারি যে, তোমরা আমার ওপর সে তরবারী চালাবার আগে আমি একটু কথা বলতে পারব, তবে আমি যা নবী কারিম (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে শুনেছি, অবশ্যই তা বলে ফেলব। নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বাণীঃ উপস্থিত ব্যক্তিরা যেন অনুপস্থিত ব্যক্তির কাছে (আমার বানী) পৌঁছে দেয়। ইব্নু আব্বাস (রাঃ) বলেন, كُونُوا رَبَّانِيِّينَ (তোমরা রব্বানি হও)। এখানে رَبَّانِيِّينَ মানে প্রজ্ঞাবান, আলিম ও ফকীহগণ। আরো বলা হয় رباني সে ব্যক্তি কে বলা হয় যিনি মানুষকে জ্ঞানের বড় বড় বিষয়ের পূর্বে ছোট ছোট বিষয় শিক্ষা দিয়ে গড়ে তোলেন।

■ শিশুদের দ্বীনি ইলম অর্জনের গুরুত্ব:

শিশুদের দ্বীনি ইলম (ধর্মীয় জ্ঞান) অর্জন তাদের ইমান মজবুত করা, চরিত্র গঠন এবং ইহকাল ও পরকালের কল্যাণের জন্য অপরিহার্য । শৈশবে শেখা জ্ঞান পাথরে খোদাইয়ের মতো স্থায়ী হয়, যা তাদের সঠিক-ভুল বুঝতে সাহায্য করে এবং সৎ মানুষ হিসেবে গড়ে তোলে । এটি শিশুর ঈমানী ভীত মজবুত করে এবং আল্লাহর প্রতি ভালোবাসা ও দায়িত্ববোধ তৈরি করে ।

শিশুদের দ্বীনি ইলম অর্জনের প্রধান গুরুত্বগুলো নিচে দেওয়া হলো:

নৈতিক ও চারিত্রিক গঠন: কুরআন ও হাদিস শিক্ষার মাধ্যমে শিশুরা সত্যবাদিতা, সততা, ও নম্রতার মতো গুণগুলো শেখে।
ইমানের ভীত মজবুত করা: শৈশবেই আল্লাহ ও রাসূল (সা.)-এর প্রতি ভালোবাসা তৈরি হয় এবং ইমানি চেতনা সুদৃঢ় হয় ।
ফরজ জ্ঞান অর্জন: ইসলামের পঞ্চস্তম্ভ (সালাত, রোজা, হজ ইত্যাদি) এবং হালাল-হারাম সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করা প্রত্যেক মুসলমানের ওপর ফরজ, যা ছোট থেকেই শেখা প্রয়োজন ।
চরিত্রের উন্নয়ন: শরিয়তের জ্ঞান মানুষকে সব ধরনের অপবিত্রতা, মন্দ কাজ ও অপসংস্কৃতির প্রভাব থেকে রক্ষা করে ।
পরকালের পাথেয়: দ্বীনি শিক্ষা প্রাপ্ত নেক সন্তানই মৃত বাবা-মায়ের জন্য সাদকায়ে জারিয়া বা পরকালের মুক্তির উসিলা হয়।

তাই শিশুকাল থেকেই তাদের কুরআন, হাদিস, ও সুন্নাহর সঠিক জ্ঞান প্রদান করা অপরিহার্য।

■ নারীর দ্বীনি শিক্ষার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা:

মানুষ সৃষ্টির সেরা জীব, আশরাফুল মাখলুকাত অর্থাৎ সর্বশ্রেষ্ঠ মাখলুক এ মানব সম্প্রদায়। যাদের উপর মহান আল্লাহ তা'আলা তাঁর বন্দেগী আবশ্যক করেছেন। এ মানব সম্প্রদায়কে মহান রাব্বুল আলামীন পৃথিবীতে সৃষ্টি করেছেন সাধারনত দুই ভাগে: (১) পুরুষ (২) মহিলা। এর মধ্যে মহান আল্লাহ তা'য়ালা যেভাবে পুরুষকে দিয়েছেন ক্ষেত—খামার, চাকরি—বাকরি, ব্যবসা—বাণিজ্য, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় বিভিন্ন রকমের দায়িত্ব। তেমনিভাবে মহিলাদেরকেও দিয়েছেন— সন্তান গর্ভে ধারণ করা, লালন—পালন করা, ঘরোয়া বিভিন্ন রকমের কাজ—কর্মগুলো আঞ্জাম দেওয়ার মাধ্যমে পুরুষকে সহযোগিতা করার দায়িত্ব।

তবে দৈহিক এবং মানসিক ভিন্নতার কারণে দুনিয়াতে চলার ক্ষেত্রে দায়িত্ব ও কর্মের কিছুটা ভিন্নতা থাকলেও মহান রাব্বুল আলামীনের পক্ষ থেকে আশরাফুল মাখলুকাত হিসেবে বান্দেগীর ক্ষেত্রে সকলেই সমানভাবে আদিষ্ট। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে—

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ.

অর্থ: আর আমি জিন ও মানবজাতিকে কেবল আমার ইবাদাতের জন্যই সৃষ্টি করেছি। (সূরা যারিয়াত,আয়াত— ৫৬)

অর্থাৎ— ইবাদত বন্দেগী পালনে মহান রবের পক্ষ থেকে নারী—পুরুষ নির্বিশেষে সকলেই সমানভাবে আদিষ্ট। আর আমরা জানি, ইবাদাত বন্দেগী পূর্ণভাবে আদায়ের জন্য ইলমে দ্বীন শিক্ষা অপরিহার্য। অর্থাৎ— যেটুকু না শিখলে ফরজ ইবাদাতগুলো পালন করা সম্ভব নয়, ততটুকু ইলম অর্জন করা প্রত্যকরে জন্য ফরয। যেহেতু ইবাদাতের ব্যাপারে নারী—পুরুষ উভয়েই আদিষ্ট, সেহেতু বিদ্যার্জনের ক্ষেত্রেও অবশ্যই উভয়ের রয়েছে সমান অধিকার, অশগ্রহণের শরীয়ত সম্মত সুযোগ ও আবশ্যকীয়তা। যেমনিভাবে হাদিসে পাকে ইরশাদ হচ্ছে—

طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ

অর্থাৎ— প্রত্যেক মুসলমান নর—নারীর জন্য দ্বীনি ইলম শিক্ষা করা ফরজ। (সুনানে ইবনে মাজাহ—১/৩৫৭পৃঃ)

ইসলাম নারী শিক্ষার বিষয়টিকে যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়েছে, যা কোরআন হাদিসের বিভিন্ন স্থানে উল্লেখ করা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন—

...يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا

অর্থ: হে ঈমানদারগণ! তোমরা নিজেদেরকে এবং আপন পরিবার—পরিজনকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচাও। (সূরা—তাহরীম,আয়াত—৬)

উক্ত আয়াতে কারীমায় মহান রাব্বুল আলামীন— 'বান্দা নিজেকে এবং সাথে সাথে পরিবার—পরিজন' (তথা—মা—বোন, স্ত্রী—সন্তানদের)কেও জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচানোর জন্যে তাগিদ দিযেছেন। জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচতে হলে অবশ্যই আল্লাহ তা'আলার ইবাদত—বন্দেগী করতে হবে, আর আল্লাহর বন্দেগী করতে হলে অবশ্যই বান্দেগীর জন্য ইলমে দ্বীনের শিক্ষা অপরিহার্য। স্পষ্টতই নারীর দ্বীনি শিক্ষার গুরুত্ব ইসলামে অপরিসীম ।

এমনিভাবে শিফা বিনতে আব্দুল্লাহ রা. থেকে বর্ণিত, হাদিসে আছে—

عن الشفاء بنت عبد الله قالت :دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا عند حفصة فقال لي :ألا تعلمين هذه رقية النملة كما علمتيها الكتابة

অর্থ: একবার নবীজী সা. আমার কাছে আসলেন, আর আমি তখন হাফসা (রা.)এর নিকটে ছিলাম। তিনি আমাকে বললেন, তুমি তাকে যেভাবে লিপিবিদ্যা শিখিয়েছো সেভাবে খুঁজলি—পাচড়ার চিকিৎসা পদ্ধতিও কেন শিখিয়ে দিচ্ছো না? (আবু দাউদ—৩৮৮৭)

উক্ত হাদিসে হযরত শিফাকে লক্ষ্য করে রাসূল (স.)এর উক্তি 'কেন শিখিয়ে দিচ্ছো না?' থেকেই ইসলামে নারী শিক্ষার সর্বোচ্চ গুরুত্বের বিষয়টি প্রতিয়মান হয়।

ইসলামে নারী শিক্ষার গুরুত্ব অপরিহার্য, যেমনিভাবে পুরুষের জন্য অপরিহার্য। তবে উভয়ের জন্য শিক্ষার পরিবেশ হতে হবে ভিন্ন এবং উভয়ের উপযোগী শিক্ষা সিলেবাস হবে ক্ষেত্রবিশেষে ভিন্ন। তবে উভয়ের শিক্ষার ভিত্তি হবে এক'ই। আর তা হলো— তাওহীদ, রিসালাত ও আখেরাত। কেননা দুনিয়াতে ভূমিষ্ট হবার পর সে ছেলে হোক বা মেয়ে, উভয়কেই প্রথমে জানতে হবে তার 'রব' সম্পর্কে। অতঃপর জানতে হবে, তার 'রব' তাকে সৃষ্টি করেছেন শুধু তাঁর দাসত্বের জন্যেই। তাকে জানতে হবে দুনিয়াতে তার রবের পক্ষ থেকে তার উপর দেয়া দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে।

নারী—পুরুষ, উভয়ের আবেগ—অনুভূতি ভিন্ন। তাই দু'বছরের শিশুর মধ্যেও দেখা যায় যে, তাদের খেলনা পৃথক, পোষাক পৃথক ও খেলার সাথীও পৃথক। লক্ষ্য করলে আরো দেখা যায় যে, তাদের রুচি, দাবী ও মানসিকতাও ভিন্ন। কন্যা শিশু বাইরে যেতে চায় না, সে হাড়ি—পাতিল নিয়ে খেলা করে। ছেলে শিশু ঘরে থাকতে চায় না, সে বাস—ট্যাক্সির খেলনায় মেতে থাকে। মেয়ে শিশু বাপের বেশী আদরের হ'লেও মায়ের কোলে ঘুমাতে সে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করে। সুতরাং প্রাকৃতিকভাবেই যেহেতু নারী পুরুষের আবেগ—অনুভূতি, রুচি ও মানসিকতা ভিন্ন ভিন্ন । তাই ছোট থেকেই তাদের শিক্ষা ব্যবস্থাও করতে হবে তাদের রুচি ও চাহিদা অনুযায়ী। তাদেরকে দিতে হবে তাদের রুচি, দাবি ও মানসিকতার অনুকূল পরিবেশ।

কেননা মাছ যেভাবে পানির বাহিরে নিরাপদ নয়, ঠিক তেমনিভাবে নারীও পর্দার বাহিরে নিরাপদ নয়। ছেলে ও মেয়ে উভয়ের মাঝে রয়েছে নিজস্ব স্বাতন্ত্রতা ও স্বকীয়তা। যার থেকে বিপরীত পরিবেশে গেলেই সে বিব্রত বোধ করে। এমনিভাবে টাইট—ফিট, অর্ধনগ্ন পোশাক, বদ্বীনি ও বেপর্দার পরিবেশে তাদের উভয়ের মন—মস্তিষ্ক অবশ্যই সংকুচিত হবে। অপরদিকে সুস্থ—সুন্দর ও পর্দার পরিবেশে উভয়ের মন—মস্তিষ্ক হবে সুপ্রসন্ন। এর বিপরীত কিছু করতে গেলেই সেটা হয়ে থাকে তাদের স্বভাব বিরুদ্ধ, যাতে ঘটে নানা বিপত্তি। ইসলাম নারী ও পুরুষের এই স্বভাবগত প্রবণতাকে গুরুত্ব দিয়েছে এবং তাদের জন্য পৃথক শিক্ষা পরিবেশ ও শিক্ষা ব্যবস্থা নিশ্চিত করেছে।

ইসলামে নারীর মূল্যায়ন:

পৃথিবীতে সব কিছুই আল্লাহ তা'য়ালার পক্ষ হতে এক একটা সম্পদ। আর এ সম্পদের মধ্য হতে সেরা সম্পদ হলো— নারী। রাসূলে কারিম (সাঃ) ইরশাদ করেন —

الدنيا كلها
متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة 12

অর্থাৎ—দুনিয়া পুরোটাই সম্পদ, আর দুনিয়ার সেরা সম্পদ হলো পূর্ণশিলা নারী।(মুসলিম শরীফ, হাদিস নং—১৪৬৭)

যে জিনিস যত বেশি মূল্যবান, তা রাখতে হয় ততটা সযত্নে ও সংগোপনে এবং তার ব্যবহারও করতে হয় অত্যন্ত সতর্কতার সাথে। মূল্যবান সম্পদকে কেউ অবমূল্যায়ন করে এখানে—সেখানে যেভাবে ফেলে রাখে না, যে কারো সামনে প্রকাশ করে না, যেন—তেনভাবে অবহেলা করে এটাকে ব্যবহার করে না। ঠিক তেমনিভাবে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সম্পদ নারীকেও বেপর্দাভাবে বাইরে বের হওয়া, যথেচ্ছায় এদিক সেদিক যাওয়া, যত্রতত্র ঘুরে বেড়ানো, যার তার সাথে দেখা—সাক্ষাৎ করা সবগুলোই তার অবমূল্যায়নের বহিঃপ্রকাশ।

মূল্যবান সম্পদ যেভাবে সংরক্ষণে অবহেলা হলে অথবা ব্যবহারে ত্রুটি হলে ঘটে অনিষ্টতা, ঠিক তেমনিভাবে নারীর ক্ষেত্রেও এর ব্যতিক্রম নয়। সুতরাং মূল্যবান জিনিসের মতো অতি মূল্যবান নারীকেও থাকতে হবে তার নির্দিষ্ট বলয়ে। হীরা, মুক্তাকে মানুষ কখনো যত্রতত্র ফেলে রাখে না, কোন ব্যক্তি যদি হীরা—মুক্তার মতো মূল্যবান জিনিসকে যত্রতত্র ফেলে রাখে তাকে কেউ জ্ঞানী বা বুদ্ধিমান বলে না, বরং সকলের দৃষ্টিতে সে প্রমাণিত হবে নির্বোধ হিসেবে। নারী হীরা—মুক্তার চেয়েও বহুগুণ দামী। সুতরাং স্বাধীনতা, আধুনিকতা বা অধিকারের নামে তাকে যত্রতত্র ছেড়ে দেওয়া নির্বুদ্ধিতারই বহিঃপ্রকাশ।

সুতরাং নারীর জন্য যেভাবে শিক্ষা জরুরী, ঠিক তেমনিভাবে শিক্ষা দানের পরিবেশ ও পদ্ধতিও হতে হবে শরীয়ত সম্মত, নববী মানহাজ অনুযায়ী। শিক্ষার কারিকুলাম হতে

হবে এমন যেখানে একজন নারী বাস্তবিক অর্থে'ই পরিণত হবে পৃথিবীর সেরা সম্পদে।তার শিক্ষার ভিত্তি হবে তাওহীদ, রিসালাত ও আখেরাত ভিত্তিক এমন এক মানহাজ, যাতে সে মন থেকেই শরীয়তের পূর্ণ অনুসারি হবে, তার জবান হবে সংযত, সে হবে শরয়ী পর্দায় অভ্যস্ত, স্বামীর অনুগত, হবে সন্তান লালন—পালনে আন্তরিক, রান্না—বান্নাসহ ঘরোয়া কাজকর্মে সুদক্ষ এবং সন্তান প্রতিপালনসহ তার এবাদত বন্দেগিগুলোর শরযী বিধান সম্পর্কে সে হবে পূর্ণ জ্ঞাত।

আদর্শ জাতি গঠনে নারীর ভূমিকা:

একটি সন্তান মায়ের কাছ থেকে প্রাথমিক পর্যায়ের যে সুশিক্ষা পেয়ে থাকে সেটাই তার জীবনে আদর্শের পথে অগ্রসর হওয়ার জন্য মূল ভিত্তি হয়ে থাকে। আর একজন মা তার সন্তানকে তখন'ই প্রাথমিক পর্যায়ের সুশিক্ষা ও আদব—কায়দা শিক্ষা দিতে সক্ষম হয় যখন দ্বীন সম্পর্কে মোটামুটি জ্ঞানগুলো যথা— সন্তান লালন—পালন, নিজের ব্যক্তিগত ও পারিবারিক বিধানগুলো তার জানা থাকে। একজন নারী দ্বীনের আহকামগুলো না জানার কারণে নিজে যেভাবে দুনিয়া—আখেরাত উভয় জাহানে ধ্বংসের দিকে অগ্রসর হতে থাকে, তেমনিভাবে তার অভিভাবক ও অধীনস্তরাও তার কারনে দুনিয়াতে বিভিন্ন ধরণের সমস্যা ও আখেরাতে ধ্বংসের সম্মুখীন হতে হয়। অপরদিকে একজন আদর্শ নারীর কারণে যেমনিভাবে তার অভিভাবকরা হয় দুনিয়া ও আখেরাতে সম্মানিত, তেমনিভাবে তার অধীনস্থরাও হয়ে থাকে উন্নত আদর্শে আদর্শিত।কেননা একটি আদর্শ জাতি গড়ার ক্ষেত্রে আদর্শ মানুষের বিকল্প নেই, আর আদর্শ মানুষ গড়ার ক্ষেত্রে একজন আদর্শ মায়ের বিকল্প নেই। আল্লামা নুরুল ইসলাম আদীব সাহেব(দা.বা.) এক বয়ানে বলেন— একটি সন্তানের দৈহিক গঠনের প্রায় ৯০ শতাংশই গঠিত হয় তার মায়ের দেহের নির্যাস মিশ্রিত পদার্থ দ্বারা। বাবার ওরশ থেকে যখন সন্তান মায়ের গর্ভে স্থানান্তরিত হয়, সন্তান গর্ভে আসার সাথে সাথেই আল্লাহ পাক রব্বুল আলামীন মায়ের দেহের রক্তের মাধ্যমে সন্তানের দেহ গঠিত হওয়ার ব্যবস্থা করে দেন। এমনিভাবে সন্তান পৃথিবীতে আসার পর অন্ততপক্ষে দুই বছর পর্যন্ত যে দুধ পান করে থাকে সেটাও মায়ের দেহ নিঃসৃত। তথা এই সন্তানের দেহের প্রায় ৯০ শতাংশই গঠিত হয় মায়ের শরীরের অংশ দ্বারা। সুতরাং বাচ্চার দেহ গঠিত হওয়ার ক্ষেত্রে যেহেতু মায়ের দেহ মিশ্রিত পদার্থের প্রভাব

বেশি। তাই মায়ের স্বভাব, চরিত্র, প্রকৃতি বাচ্চার উপর স্বাভাবিকভাবেই খুব বেশি'ই প্রভাব বিস্তার করবে। আর এটাই স্বাভাবিক।

দ্বীন শিক্ষা না করার ক্ষতি:

বর্তমান সময়ে অধকিাংশ অভিভাবকই শংকিত তার সন্তানকে নিয়ে। কেননা সুশিক্ষার অভাবে আজ ছেলে বাবার কথা শুনছে না, মেয়ে মায়ের কথা মানছে না। পশ্চিমা ভাবধারায় চলতে গিয়ে তারা আজ নিজেদেরকে ঠেলে দিচ্ছে শৃংখলহীন এমন এক জীবনের দিকে, যেখানে পারিবারিক ব্যবস্থা ভেঙে পড়ছে, মানুষের বংশপরিচয় বিলুপ্তির পথে, পিতৃপরিচয়হীন সন্তানের সংখ্যা বেড়ে চলছে, যিনা—ব্যভিচারের ফলে ব্যাপক হারে বাড়ছে নতুন নতুন রোগ—ব্যাধি, লজ্জা—শরমের মতো চারিত্রিক মহাসম্পদ সমাজ থেকে ক্রমশই হারিয়ে যাচ্ছে।অবশেষে বয়স বাড়ার পর মহিলাদের জীবন নিজের জন্যই বোঝা হয়ে দাঁড়াচ্ছে।

পশ্চিমা সভ্যতা, যাদেরকে আমরা পৃথিবীর সবচেয়ে উন্নত দেশ এবং সুখী মানুষ বলে মনে করি, যেখানে যেতে পারা, বসবাস করতে পারা অথবা সেখানে যেতে না পারলেও অন্তত পক্ষে নিজের দেশে থেকে তাদের সাংস্কৃতি অনুযায়ী চলতে পারাকে আমরা অনেকেই নিজেদের জাগতিক সফলতার চাবিকাঠি মনে করে থাকি। অথচ তাদের জীবনের সচরাচর বাস্তব অবস্থা হলো এমন, যা আমি সংক্ষিপ্তাকারে উপরে উল্লেখ করেছি।অপরদিকে ইসলামি সভ্যতার ছায়াতলে আশ্রয় নেয়া লোকগুলোর জীবন আচার, চলাফেরা তার সম্পূর্ণ বিপরীত। দ্বীনের সুশীতল ছায়ায় আশ্রয় নেয়ার ফলে একটা গরীব থেকে গরিব লোকও স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে প্রাণ ভরে, কোরআন—হাদিসের পড়শে তার জাগতিক জীবনে সে অনুভব করে এক অনাবিল প্রশান্তি। আর এটা, যে যতটুকু কোরআন—হাদিস অনুযায়ী চলে, যে দ্বীনের ছায়াতলে যতটুকু আশ্রয় নেয় এবং যে যতটুকু কোরআন—হাদিস অনুযায়ী নিজের জীবন পরিচালনা করে, সে ততটুকু অনুভব করতে পারে।

সুতরাং একটা পরিবারকে দ্বীনের সুশীতল ছায়াতলে আনার জন্য, সেই পরিবারকে ইসলামিক পরিবার হিসেবে গড়ে তোলার জন্য, নারীর কোন বিকল্প নেই। অপরদিকে কোন নারী যদি নৈতিকতাহীনভাবে সমাজে চলাফেরা করে, তাহলে তার একজনের

ক্ষতি আরও দশটা নীতিহীন পুরুষের ক্ষতির চেয়েও অনেকগুণ বেশি হয়ে থাকে। তাই ফিতনামুক্ত দ্বীনি পরিবেশের সুন্দর সমাজ বিনির্মাণে নারীর জন্য দ্বীনি শিক্ষার বিকল্প নেই ।কেননা যে পথে বিপর্যয় আসে সে পথেই তা রোধ করতে হয়। কিন্তু আফসোসের বিষয় হলো, সেদিকে আমরা তেমন একটা মনোযোগ দেইনি।
ইসলামের শুরু যুগে শিক্ষা ও দাওয়াতের কাজে নারীসমাজের বিশেষ ভূমিকা ছিল। তাফসীর, হাদীস, ফিক্হ, সাহিত্য ও ইসলামের প্রচার—প্রসারে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখত তারা। অথচ বর্তমানে আমাদের মানসিকতা এমন হয়েছে যে, কেবল রান্না—বান্না করা, স্বামীর খেদমত করা ও সন্তানের লালন—পালন করা, অনেকে আবার আধুনিকতা ও প্রতিষ্ঠিত হওয়ার নামে অফিস—আদালত, রেস্টুরেন্ট বা অন্য কোন প্রতিষ্ঠানে চাকরি করতে পাড়াকে'ই মহিলাদের কাজ মনে করে থাকে।
অবশ্য মহিলারা যদি উপরোক্ত কাজসমূহ শরয়ী বিধান অনুসারে করে থাকে, তাহলে অবস্থাভেদে এগুলোও তাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ ও সাওয়াবের কাজ বলে বিবেচিত হতে পারে, কিন্তু শরয়ী বিধান অনুসারে কোন কাজ করতে হলে তো তাকে আগে শরয়ী বিধান সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করতে হবে, অথচ সেদিকে আমাদের কোন গুরুত্ব'ই নেই।

উত্তরণের পন্থা ও করণীয়:

নারীর উপর দ্বীনি ইল্ম শিক্ষা করার এই ফরয আদায় করার বিভিন্ন পন্থার সাথে সাথে যুগ চাহিদার প্রেক্ষিতে বর্তমানে মেয়েদের জন্য মহিলা মাদরাসায় অধ্যয়ন করাও সহজ একটা মাধ্যম। কেননা যদিও আমাদের পূর্বসূরীদের পন্থা ছিল যে, তারা নিজেদের মেয়েদেরকে ঘরেই তালিম দান করত এবং নিজেরাই শিক্ষকের ভূমিকা পালন করতো। কিন্তু যুগ পরিবর্তনের প্রেক্ষিতে বর্তমান বাবা—মায়েদের জন্য সেই ফুরসত হয়ে ওঠেনা, তাছাড়া বর্তমান বাবা—মায়েদেরও ঐরকম দ্বীনি জ্ঞান না থাকার কারণে তারা নিজেরাই থাকে দিকভ্রান্ত। এহেন পরিস্থিতিতে দ্বীনের উপর চলার জন্য যে ইলম অর্জন করা জরুরি, তার জন্য বর্তমানে মহিলা মাদরাসাগুলোর ভূমিকা অপরসীম।
বর্তমানে এই মাদরাসাগুলো নারীদের দ্বীনি শিক্ষার ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। সারা দেশে এর শাখা—প্রশাখা ছড়িয়ে পড়েছে এবং এগুলোর মাধ্যমে

মুসলমানদের মেয়েরা দ্বীনি শিক্ষা অর্জনের ক্ষেত্রে অনেক দূর এগিয়ে যাচ্ছে, আলহামদুলিল্লাহ।

কিন্তু বর্তমানে নারী জনসংখ্যার তুলনায় মাদরাসায় পড়–য়া নারীদের সংখ্যা খুবই নগণ্য। অপরদিকে বিশাল এক সংখ্যা রয়ে যাচ্ছে যারা স্কুল, কলেজ—ভার্সিটিসহ বিভিন্ন ধরণের সহশিক্ষা ও সহাবস্থানের পরিবেশে পড়াশোনা বা অবস্থান করছে। তারা যদিও বিভিন্ন বিষয়ে উচ্চতর ডিগ্রি ও দুনিয়াবি উন্নতি অর্জন করছে, কিন্তু দ্বীনি বিষয়ে এতটা অনবগত যে, দেখে দেখে কোরআন পড়তেও অক্ষম এবং নিজেদের একান্ত প্রয়োজনীয় মাসায়িলগুলো সম্পর্কেও সম্পূর্ণ অনবগত। এমন নারীদের জন্যেও দ্বীনি শিক্ষার ব্যবস্থা করা অত্যান্ত জরুরি। চাই তা রাষ্ট্রীয়ভাবে হোক বা তাদের অধ্যয়নরত প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে, অথবা কারো ব্যক্তিগত উদ্যোগে। যেভাবেই হোক না কেন, প্রতিটি স্তরের প্রতিটি বয়সের, প্রতিটি নারী—পুরুষের জন্য দ্বীনি শিক্ষার ব্যবস্থা করা অত্যন্ত জরুরি।

তবে আশার বাণী হচ্ছে এই যে, রাষ্ট্রীয়ভাবে না হলেও, সামাজিক বা ব্যক্তিগতভাবে বিভিন্ন এলাকায় মসজিদ বা বাসা কেন্দ্রিক নারী—পুরুষের ভিন্ন ভিন্ন ভাবে দ্বীনি শিক্ষার জন্যে উদ্যোগ পরিলক্ষিত হচ্ছে। তবে এটা আরো ব্যাপক ও সুশৃংখলতার সহিত হওয়া উচিত। বিশেষ করে সহীহ পদ্ধতি অবলম্বন করে স্কুলগুলোতেও দ্বীনি শিক্ষার ব্যবস্থা করা অত্যন্ত জরুরি। যতদিন পর্যন্ত খেলাফত পুনরুদ্ধারের মাধ্যমে দেশে ইসলামী হুকুমত প্রতিষ্ঠিত না হবে, ততদিন পর্যন্ত অন্তত দ্বীনকে টিকিয়ে রাখতে, মানুষের মধ্যে দ্বীনী ইলম বিস্তার করার ক্ষেত্রে সামাজিক বা ব্যক্তিগত এসব উদ্যোগের বিকল্প নেই।

পরিশেষে সকলের প্রতি আহ্বান করবো— আসুন! যেখানে যেখানেই এভাবে ছোট—বড় পরিসরে দ্বীনি শিক্ষাদানের কার্যক্রম পরিলক্ষিত হয়, সেখানেই আমরা সকলেই এগিয়ে আসি এবং নিজের যোগ্যতা, অবস্থান ও সাধ্য অনুযায়ী তাতে সহযোগি হই। আল্লাহ তা'য়ালা আমাদের সকলকে দ্বীনি ইলম প্রচার—প্রসারের খেদমতে শামিল হওয়ার তাওফিক দান করুন, আমিন, ইয়া রাব্বাল আলামিন।

■ পুরুষের দ্বীনি ইলম অর্জনের গুরুত্ব:

পুরুষের জন্য দ্বীনি ইলম (ধর্মীয় জ্ঞান) অর্জন করা ফরয বা অপরিহার্য, কারণ এটি সঠিক ইবাদত, হালাল-হারাম জ্ঞান, এবং আল্লাহর সন্তুষ্টির মাধ্যমে জান্নাত লাভের একমাত্র পথ। ইলম মানুষের মনুষ্যত্ব বিকশিত করে, পরিবার ও সমাজ পরিচালনায় সঠিক দিকনির্দেশনা দেয় এবং একজন পুরুষকে তার দায়িত্ব পালনে যোগ্য হিসেবে গড়ে তোলে ।

পুরুষের দ্বীনি ইলম অর্জনের গুরুত্বের মূল দিকগুলো নিচে দেওয়া হলো:

ফরয ইবাদত: রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, "ইলম অর্জন করা প্রত্যেক মুসলমানের (নারী-পুরুষ) ওপর ফরয"।
সঠিক আমল ও ইবাদত: জ্ঞান ছাড়া ইবাদত কবুল হয় না। সঠিক নিয়ম ও নিষ্ঠার সাথে নামাজ, রোজা, এবং হালাল-হারাম বর্জন করতে হলে দ্বীনি জ্ঞান অপরিহার্য ।
জান্নাতের পথ সহজ হওয়া: যে ব্যক্তি জ্ঞান অন্বেষণের পথ অবলম্বন করে, আল্লাহ তার জন্য জান্নাতের পথ সহজ করে দেন ।
পারিবারিক ও সামাজিক দায়িত্ব: একজন পুরুষ হিসেবে পরিবার, সমাজ এবং রাষ্ট্রে দ্বীনের সঠিক বিধি-বিধান প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনার জন্য ইলম অর্জন করা জরুরি ।
উত্তম চরিত্র গঠন: ইলম বা জ্ঞান মানুষকে অজ্ঞতা থেকে মুক্তি দেয় এবং মানুষের মধ্যে মনুষ্যত্ব ও সুন্দর চরিত্র তৈরি করে ।
উচ্চ মর্যাদা: আল্লাহ তাআলা জ্ঞান অর্জনকারীকে সর্বোচ্চ সম্মান দান করেন এবং দ্বীনের জ্ঞান অর্জনকারীকে নবীগণের ওয়ারিশ হিসেবে গণ্য করা হয় ।
সংক্ষেপে, দুনিয়া ও আখিরাতের সফলতার জন্য পুরুষের দ্বীনি ইলম অর্জন অত্যাবশ্যকীয়।

■ বড়দের দ্বীনী শিক্ষার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা:

মানুষের জীবন পরিবর্তনশীল। বিভিন্ন সময় বিভিন্ন কারণে মানুষের জীবননদী নতুন বাঁক নেয়। পরিবর্তনের ছোঁয়া লাগে মনের মাঝে। তখন আমরা আবার নতুন করে ভাবতে শুরু করি । পিছনের জীবনের হিসাব নিই। অসংখ্য মানুষ এমন আছেন, যাদের জীবনের দীর্ঘ একটা সময় জাগতিক জ্ঞান অর্জন, ব্যবসা-বাণিজ্য, চাকরি-বাকরি ইত্যাদিতে কেটে যায়। পরিবেশ-পারিপার্শ্বিকতার দরুন দ্বীনের মৌলিক জ্ঞানটুকুও অর্জন করার সুযোগ হয়ে ওঠে না। পারিবারিক অসচেতনতা, দ্বীন শিক্ষার অনুকূল পরিবেশ না পাওয়া, কিংবা নিজের অবহেলা এক্ষেত্রে অন্যতম প্রধান কারণ।

জীবনের দীর্ঘ পথ পাড়ি দেয়ার পর নিজের মাঝে নতুন উপলব্ধি জাগে। অতীত জীবনের উপর অনুশোচনা হয়। হয়ত কোনো আল্লাহওয়ালার সোহবতে কিংবা কোনো দ্বীনী মেহনতের বরকতে অথবা অন্য কোনো মাধ্যমে । তখন দ্বীনী ইলম না শেখার উপর আক্ষেপ হতে থাকে মনের গভীরে। এই উপলব্ধি, আক্ষেপ ও অনুশোচনা একটি ইতিবাচক দিক, যা ব্যক্তিকে নিজের জীবন নতুনভাবে গড়ার এবং আলোকিত পথের পথিক হওয়ার জন্য উৎসাহিত করে। ভেতরে প্রেরণা যোগায়। তবে অনেকের ক্ষেত্রে দুঃখজনক একটি বাস্তবতা হল, মনের ভেতর উপলব্ধি ও অনুশোচনা জাগলেও এর উপর ভিত্তি করে কোনো ইতিবাচক পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয় না। দ্বীনী জীবন গঠনে যতটুকু উৎসাহ দেখা যায় দ্বীনী শিক্ষা অর্জনে ততটুকু উৎসাহ দেখা যায় না।

দ্বীনী শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা:

এ পৃথিবীতে আল্লাহ তাআলা মানুষকে সবচেয়ে সম্মানিত করে সৃষ্টি করেছেন। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে-

وَ لَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِيْٓ اٰدَمَ.

আমি বনী আদমকে সম্মানিত করেছি। -সূরা বনী ইসরাঈল (১৭) : ৭০

অন্যান্য প্রাণিজগত থেকে মানবজাতির রয়েছে স্বাতন্ত্র্য ও বৈশিষ্ট্য; যা মানুষকে মহিমান্বিত করে তুলেছে এবং অন্যান্যদের মাঝে বিশেষ মর্যাদা দান করেছে। অন্যান্য প্রাণি শুধু তাদের জীবন ও প্রাণ রক্ষার তাগিদে নিজের সমস্ত চেষ্টা ও শ্রম ব্যয় করে। জীবন ধারণের এ সহজাত বোধ ও প্রবণতাকে কেন্দ্র করে তাদের দিন-রাতের সমস্ত কর্ম আবর্তিত। তাদের জীবন থাকে নির্দিষ্ট স্বভাবের গণ্ডিতে বাঁধা। যার বৃত্ত থেকে কখনো তাদের উত্তরণ ঘটে না। কিন্তু মানুষ এর থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। কেবল জীবন ধারণ ও জীবন যাপন করাই মানুষের সৃষ্টির মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নয়; বরং ইবাদাত তথা আল্লাহ তাআলার বন্দেগি করার জন্যই মানব জাতিকে আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন। ইরশাদ হয়েছে-

وَ مَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَ الْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُوْنِ.

আমি সৃষ্টি করেছি জিন্ন ও মানুষকে এজন্য যে, তারা আমারই ইবাদত করবে। -সূরা যারিয়াত (৫১) : ৫৬

তাই আল্লাহর ইবাদত করা ও তাঁর হুকুম মেনে চলা মুমিন বান্দার মূল দায়িত্ব। আল্লাহ তাআলার হুকুম জীবনের সমস্ত অঙ্গন জুড়ে পরিব্যাপ্ত। ব্যক্তিজীবন, পারিবারিক জীবন, সামাজিক জীবন সবকিছুতেই রয়েছে আল্লাহ তাআলার হুকুম। একজন প্রকৃত মুমিন জীবনের কোনো ক্ষেত্রেই আল্লাহর হুকুম লংঘন করে না। তাই কোন্ ক্ষেত্রে আল্লাহর কী আদেশ ও কী নিষেধ তা জানা একজন মুমিনের অবশ্যকর্তব্য। বুঝা গেল, দ্বীনী ইলম শিক্ষা করা এমন কোনো ঐচ্ছিক বিষয় নয়, যা না শিখলেও হয়। বরং আমাদের সৃষ্টির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্যই এ শিক্ষা আমাদের অর্জন করতে হবে।

দ্বীনী শিক্ষা অর্জনের ফযীলত:

যদিও পূর্বে বিশদভাবে আলোচনা করা হয়েছে , তবুও এখানে সংক্ষেপে তুলে ধরা হলো।

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন-

يَرْفَعِ اللهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ وَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ دَرَجٰتٍ.

তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছে এবং যাদেরকে ইলম দান করা হয়েছে আল্লাহ তাদের মর্যাদা বাড়িয়ে দেবেন বহুগুণ। -সূরা মুজাদালা (৫৮) : ১১

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন-

خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ.

তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম সেই ব্যক্তি, যে কুরআন শিক্ষা করে এবং শিক্ষা দেয়। -সহীহ বুখারী, হাদীস ৫০২৭

অন্য হাদীসে ইরশাদ হয়েছে-

مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا، سَهَّلَ اللهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ.

যে ব্যক্তি ইলম শিক্ষার জন্য কোনো পথ অবলম্বন করে আল্লাহ তার জান্নাতের পথ সহজ করে দেন। -সহীহ মুসলিম, হাদীস ২৬৯৯

অন্য হাদীসে ইরশাদ হয়েছে-

مَنْ يُرِدِ اللهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ.

আল্লাহ যার কল্যাণ চান তাকে দ্বীনের বুঝ দান করেন। -সহীহ বুখারী, হাদীস ৭১

অধিকাংশ সাহাবী দ্বীনী ইলম অর্জন করেছেন বয়স্ক অবস্থায়:

বয়স বেশি হওয়া এমনকি বৃদ্ধ হয়ে যাওয়াও দ্বীনী শিক্ষা অর্জনে প্রতিবন্ধকতা নয়। সাহাবায়ে কেরাম হলেন সর্বপ্রথম ইলমে ওহী শিক্ষা গ্রহণকারী। নবুওতের পাঠশালার সর্বপ্রথম ছাত্র। তাঁদের বক্তব্য ও শিক্ষার আলোকেই আমাদের কুরআন-সুন্নাহ্ বুঝতে হয়। অথচ তাঁদের অধিকাংশই বয়স অনেক হওয়ার পর ইসলাম গ্রহণ করেছেন এবং দ্বীন শিখেছেন। নবীজীর পর এ উম্মতের সবচে বড় জ্ঞানী হলেন আবু বকর রা.। অথচ তিনি যখন নবীজীর সংস্পর্শধন্য হয়ে ইলম শেখা শুরু করেছেন তখন তাঁর বয়স ছিল প্রায় ৪০ বছর। এমনিভাবে ওমর রা., আবু যর রা., আবুদ দারদা রা., প্রমুখ উম্মতের সবচে জ্ঞানী এ মহামানবগণ ইলম শিখেছেন বয়স অনেক হয়ে যাবার পর। ইমাম বুখারী রাহ. হযরত ওমর রা.-এর এ বক্তব্য উল্লেখ করেছেন-

" باب الاغتباط في العلم والحكمة وقال عمر :تفقهوا قبل أن تسوَّدوا"..

তোমরা বয়স অধিক হওয়ার আগেই ইলম শিখে নাও।

সহীহ বুখারীতে ওমর রা.-এর এ বক্তব্য উল্লেখ করে ইমাম বুখারী রাহ. এর ব্যাখ্যায় বলেন-

قال أبو عبد الله -يعني البخاري نفسه- :وبعد أن تسوّدوا، وقد تعلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في كبر سنِّهم.

অর্থ্যাৎ বয়স বেশি হওয়ার পরও ইলম শিক্ষা কর। কারণ সাহাবায়ে কেরাম (অধিকাংশ) তো বয়স অধিক হওয়ার পরই দ্বীনী ইলম শিক্ষা করেছেন। -সহীহ বুখারী, পৃ. ৩৯

খোদ ওমর রা.-এর অবস্থাই দেখুন, বয়স হবার পরও কীভাবে তিনি দ্বীনী ইলম শিখেছেন। তিনি বলেন, আমি ও আমার এক আনসারী প্রতিবেশী পালাক্রমে নবীজীর কাছে যেতাম। সে একদিন থাকত। আমি একদিন থাকতাম। যেদিন আমি থাকতাম

সেদিনকার ওহী ও অন্যান্য বিষয় আমি তাকে জানাতাম। আর যেদিন সে থাকত সেও অনুরূপ করত। (দ্র. সহীহ বুখারী, বর্ণনা ৮৯)

বড়দের দ্বীনী শিক্ষা অর্জনের ক্ষেত্রে সাহাবায়ে কেরাম হতে পারেন আমাদের প্রেরণার উৎস।

বৈষয়িক সুখ-সমৃদ্ধি লাভ করা জাগতিক শিক্ষা অর্জনের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য। ভালো একটা চাকরি পাওয়া, একটু সুখী জীবন লাভ করার জন্যই সাধারণত এ শিক্ষা অর্জন করা হয়। কিন্তু দ্বীনী শিক্ষা এর থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। শুধু পার্থিব জীবনই নয় পরকালীন জীবনের কল্যাণ লাভ করা এ ইলম অর্জনের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য। আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন, তাঁর হুকুম আহকাম জেনে সে অনুযায়ী জীবনযাপন, নবীজীর সুন্নতের অনুসরণ, ফেরেশতাদের দুআ-ইসতিগফার লাভ ইত্যাদি সবকিছুই ইলমে দ্বীন শিক্ষা করার ফযীলত। আর যে কোনো মানুষই বোঝে, এ ফযীলত অর্জনের নির্দিষ্ট কোনো বয়স নেই। যে কোনো মানুষই ইলম শিক্ষা করার মাধ্যমে এ ফযীলতগুলো অর্জন করতে পারে।

قيل لأبي عمرو بن العلاء :هل يحسن بالشيخ أن يتعلم؟ قال :إن كان يحسن به أن يعيش فإنه يحسن به أن يتعلم.

আবু আমর ইবনুল আলা'কে একবার জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, বৃদ্ধ বয়সে ইলম শিক্ষা করা কি উত্তম কাজ? তিনি উত্তরে বলেন, বেঁচে থাকাটা যদি তার জন্য উত্তম হয় তবে ইলম অর্জন করা কেন উত্তম হবে না! -আলফাকীহ ওয়াল মুতাফাক্কিহ, খতীব বাগদাদী, খ. ২, পৃ. ১৬৭

কোনো একজন আলেমকে একবার জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, কতদিন পর্যন্ত মানুষকে শিখতে হবে? তিনি উত্তরে বলেন, মৃত্যু পর্যন্ত।

আমাদের ইতিহাস আলো করে আছে এমন অসংখ্য মহামানবদের ঘটনা, মৃত্যুর আগ মুহূর্ত পর্যন্ত যারা ইলম চর্চা করেছেন। ইমাম আবু ইউসুফ রাহ. মৃত্যুর ঠিক আগ

মুহূর্তেও ইলমের মুযাকারা করেছেন। এরকম অসংখ্য নযীর আছে আমাদের ইতিহাসে।

পরিণত বয়সে দ্বীন শেখার কিছু ইতিবাচক দিক:

কিছু বয়স হওয়ার পর দ্বীন শেখার ইতিবাচক দিক রয়েছে, যা ইলম অর্জনের জন্য অনেক সহায়ক। কারণ, অনেক ক্ষেত্রেই শিশু-কিশোর অভিভাবকদের চাপে ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় দ্বীনী ইলম অর্জন করে। ভেতরের প্রেরণা, নিজের ইচ্ছা, ফযীলত অর্জন করার মানসিকতা অনেক ক্ষেত্রেই থাকে অনুপস্থিত। তবে একজন বয়স্ক ব্যক্তির দ্বীন শিক্ষা করার অবস্থা হয় এর থেকে ভিন্ন। বয়স্ক ব্যক্তির মনে দ্বীনী শিক্ষা অর্জনের প্রেরণা সৃষ্টি হয় মনের ভেতর থেকে। সেখানে অন্যের পক্ষ থেকে চাপ কিংবা বাধ্যবাধকতারও কোনো ব্যাপার থাকে না; বরং সাধারণত ব্যক্তি নিজ উদ্যোগে ইলম অর্জনের ফযীলত হাসিল করার জন্য এবং সহীহভাবে দ্বীনের উপর চলার জন্য দ্বীনী ইলম অর্জনে সচেষ্ট হয়। হৃদয়ের আহ্বানে সাড়া দিয়েই ইলম অর্জনে নিমগ্ন হয়। তাই বয়স্ক ব্যক্তির অদম্য আগ্রহ, তীব্র বাসনা তাকে অনেক দ্রুত এগিয়ে নিয়ে যায় লক্ষ্যপানে।

তাছাড়া একজন বয়স্ক ব্যক্তির বুঝ ও অনুধাবন শক্তি তীক্ষ্ম হয়ে থাকে। যে কোনো বিষয় অল্প সময়ে বোঝা ও অনুধাবন করা তার জন্য সহজ। ফলে দ্বীনের অনেক কিছুর বুঝ অল্প সময়েই তার অর্জন হয়, যা শেখাকে সহজ ও ত্বরান্বিত করে। সাথে সাথে বাস্তব অনুশীলনের মাধ্যমে ইলম অনুযায়ী আমল করার সাওয়াবও অর্জিত হয়।

পড়াশোনার ক্ষেত্রে আগ্রহ ও পূর্ণ মনোযোগ খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আগ্রহ ও মনোযোগ পূর্ণমাত্রায় থাকলে দীর্ঘ সময়ের পড়া অল্প সময়েই আয়ত্ত হয়ে যায়। পরিণত বয়সের একজন ব্যক্তির ক্ষেত্রে দ্বীনী শিক্ষা অর্জনের সময় এ আগ্রহ ও মনোযোগ সাধারণত পূর্ণ মাত্রায় থাকে, যা অল্প সময়ে তাকে অনেক এগিয়ে দেয়।

সালাফের জীবন থেকে কিছু উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত:

ইসলামের ইতিহাস আলো করে আছে এমন অসংখ্য মনীষী রয়েছেন, যাদের বয়স অনেক হয়ে যাওয়ার পর তাদের হৃদয়ে ইলম অর্জনের আগ্রহ জেগেছিল। এরপর নিরন্তর মেহনত ও অব্যাহত মুজাহাদার মাধ্যমে তারা ইলম অর্জন করেন এবং নিজেদের ও অন্যদের ইলমের আলোয় আলোকিত করেন। এমন কয়েকজন মনীষীর সংক্ষিপ্ত আলোচনা নিম্নে তুলে ধরা হল।

আলী ইবনে হামযা

ইমাম কিসাঈ নামেই যিনি সমধিক প্রসিদ্ধ। ইলমে নাহুর প্রতিটি ছাত্র এই নামের মহান মানুষটির সাথে পরিচিত। আরবী ব্যাকরণশাস্ত্রে যার রয়েছে বিশাল অবদান। ইলমে কিরাআতেরও অন্যতম ইমাম তিনি। যে সাত কেরাতের কথা আমরা সবাই জানি, সে সাত কেরাতের এক কেরাত তাঁর দিকেই সম্পৃক্ত। তিনি বয়স অনেক হওয়ার পরই ইলমে নাহু শেখা শুরু করেছেন। আল্লামা কিফতী রাহ. বলেন-

انما تعلم الكسائي النحو بعد الكبر فلم يمنعه ذلك من ان برع فيه .

কিসাঈ বয়স অনেক হওয়ার পরই নাহু শেখা শুরু করেন। এ শাস্ত্রে পাণ্ডিত্য অর্জনে অধিক বয়স তার জন্য বাধা হয়নি। -আমবাউর রুয়াত ২ / ২৭১

আবদুর রাহমান ইবনুল কাসেম

মালেকী মাযহাবের অন্যতম ইমাম। ইমাম মালেক রাহ.-এর সবচে কাছের ছাত্রদের অন্যতম। মালেকী মাযহাবের বিখ্যাত কিতাব আলমুদাওওয়ানাতুল কুবরার রচয়িতাও তিনি। মালেকী মাযহাবে মাশহুর রেওয়ায়েত বলতে উপরোক্ত গ্রন্থে ইবনুল কাসেম বর্ণিত ইমাম মালেক রাহ.-এর বক্তব্যকেই বুঝানো হয়। এ মহান মনীষীও ইলম শেখা শুরু করেছেন বয়স অনেক হওয়ার পর। কাযী ইয়ায রাহ. লিখেন-

قال ابن وضاح سمع ابن القاسم من المصريين والشاميين، وإنما طلب وهو كبير.

ইবনে ওয়াযযাহ বলেছেন, ইবনুল কাসেম মিসর ও শামের উলামায়ে কেরাম থেকে ইলম অর্জন করেছেন। আর তিনি অনেক বয়স হওয়ার পর ইলম অণে¦ষণ শুরু করেন। -তারতিবুল মাদারিক ৩/২৪৮

আল্লামা ইবনে হাযম (রাহ.)

ইসলামের ইতিহাসে যারা অমর হয়ে আছেন তিনি তাদের অন্যতম। আল্লামা যাহাবী রাহ. তার ব্যাপারে বলেন-

ومن أشهر من ذكر عنهم الطلب بعد كبر السن ابن حزم الأندلسي.

বয়স হওয়ার পর যারা ইলম শেখা শুরু করেছেন তাদের মধ্যে প্রসিদ্ধ হলেন ইবনে হাযম আন্দালুসী।

তার ইলমে ফিকহ অন্বেষণের সূচনা হয়েছিল বিশেষ একটি ঘটনার প্রেক্ষাপটে। ইবনে হাযম রাহ. নিজেই সে ঘটনা বলেছেন। একদিন তিনি এক জানাযায় শরিক হন। তখন এক মসজিদে প্রবেশ করে বসে পড়েন। এক ব্যক্তি তখন তাকে বলল, ওঠ, আগে তাহিয়্যাতুল মাসজিদ নামায পড়। তখন তার বয়স ছিল ছাব্বিশ। তিনি তখন নামাযে দাঁড়িয়ে যান। জানাযা শেষে ফিরে আসার সময়ও মসজিদে যান। এবার প্রবেশ করা মাত্রই নামায শুরু করে দেন। তখন তাকে বলা হল, আরে বস বস; এখন নফল নামায পড়ার সময় নয়। তখন ছিল আসরের পর। এ ঘটনাটি তার মনে গভীরভাবে দাগ কাটে। এরপর থেকেই তিনি ইলম অর্জন শুরু করেন।

(মু'জামুল উদাবা, ইবনে হাযম রাহ.-এর জীবনী)

ইয্যুদ্দীন ইবনে আবদুস সালাম

ইলমী আকাশের উজ্জ্বল নক্ষত্র। সত্য কথন ও সাহসী উচ্চারণে প্রসিদ্ধ ব্যক্তিত্ব। আল্লামা ইবনে দাকীকুল ঈদ যাকে সুলতানুল উলামা (উলামা-সম্রাট) উপাধি দিয়েছেন। বাস্তবিক অর্থেই তিনি ছিলেন সম্রাটতুল্য একজন মানুষ। মানুষের হৃদয়জগতে তিনি ছিলেন সম্রাটের চেয়েও সম্মানিত। পরাক্রমশালী শাসকেরা পর্যন্ত মাথা নত করত তার সামনে। ইয্যুদ্দীন রাহ.-এর জানাযার খাট নিয়ে মানুষ যখন শাহী প্রাসাদের নিচ দিয়ে যাচ্ছিল তৎকালীন শাসক আলমালিকুয যাহির তখন বলেছিল-

আজ আমার রাজত্ব স্থিতিশীলতা লাভ করেছে। এই শায়েখ যদি জনগণকে আমার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে বলতেন তাহলে তিনি আমার থেকে রাজত্ব ছিনিয়ে নিতে পারতেন। -তবাকাতুশ শাফিইয়্যাতিল কুবরা ৮/২১৫

এই উলামা-সম্রাটও ইলম শেখা শুরু করেছেন বয়স অনেক হওয়ার পরে। তার জীবনীতে লেখা হয়েছে-

كان الشيخ عز الدين في أول أمره فقيرا جدا ولم يشتغل إلا على كبر.

ইয্যুদ্দীন রাহ. প্রাথমিক অবস্থায় খুবই গরীব ছিলেন। তিনি ইলম অর্জনে মাশগুল হয়েছেন অনেক বয়সে। -তবাকাতুশ শাফিইয়্যাতিল কুবরা ৮/২১৫

এগুলো তো গেল সালাফের যুগের ঘটনা। আমাদের এ যুগেও বয়স হওয়ার পর দ্বীনী ইলম অর্জনের অসংখ্য দৃষ্টান্ত রয়েছে।

অতীত ও বর্তমানে বয়স্ক দ্বীনী শিক্ষার এত অসংখ্য নযীর রয়েছে যে তা নিয়ে আলাদা গ্রন্থ তৈরি হতে পারে। এসকল মানুষেরা আমাদের জন্য হতে পারেন প্রেরণার উৎস।

পরিণত বয়সে দ্বীন শেখার ক্ষেত্রে কিছু প্রতিবন্ধকতা:

বয়সকালে দ্বীন শেখার ক্ষেত্রে একটি চিন্তা অনেকের মনেই উঁকি দেয়। তা হল, বয়স একটু বেশি হয়ে গেলে কিছু আর মনে থাকতে চায় না। কোনো কিছু মুখস্থ করতে হলে অনেক সময় লাগে। এ চিন্তার বাস্তবতা অস্বীকার করা যায় না। তবে এ বাস্তবতা মেনে নিয়েই বলছি, মানুষ যখন কোনো কাজের হিম্মত করে তার জন্য শতভাগ চেষ্টা ব্যয় করে তখন সে কাজটি আল্লাহ তাআলা তার জন্য সহজ করে দেন। একটা উদাহারণ দেই। ইমাম কাফফাল শাশী। ফিকহে শাফেয়ীর অবিসংবাদিত ইমাম। আল্লামা সামআনী রাহ. তার ব্যাপারে লিখেছেন-

كان وحيد زمانه فقها وحفظا وورعا وزهدا، وله في المذهب من الآثار ما ليس لغيره من أهل عصره، وطريقته المهذبة في مذهب الشافعي التي حملها عنه أصحابه أمتن طريقة، وأكثرها تحقيقا، رحل إليه الفقهاء من البلاد، وتخرج به أئمة، ابتدأ بطلب العلم وقد صار ابن ثلاثين سنة، فترك صنعته، وأقبل على العلم.

তিনি ছিলেন জ্ঞান, প্রজ্ঞা, মুখস্থশক্তি এবং তাকওয়া-পরহেযগারিতে যুগের অনন্য ব্যক্তি। ফিকহে শাফেয়ীর মধ্যে তার যে প্রভাব ও অবদান রয়েছে তা তার যুগের অন্য কারো ছিল না। বিভিন্ন দেশ থেকে ফকীহগণ ইলম অর্জনের জন্য তার উদ্দেশে সফর করতেন। তার হাতে অনেক ইমাম গড়ে উঠেছেন। এ মহান মনীষীও ইলম শেখা শুরু করেছেন ৩০ বছর বয়সে। ইলম শেখা শুরু করার পর তিনি তার পেশা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে ইলম অর্জনে নিমগ্ন হন। -সিয়ারু আলামিন নুবালা ১৩/১৩০

আল্লামা সুবকী রাহ, তার ব্যাপারে লেখেন-

الإمام الزاهد الجليل البحر أحد أئمة الدنيا ...كان قد ابتدأ التعلم على كبر السن بعدما أفنى شبيبته في صناعة الأقفال.

তিনি হলেন পৃথিবীবিখ্যাত ইমামদের অন্যতম। তালা বানানোর পেশায় যৌবন কাটিয়ে শেষ বয়সে তিনি ইলম অর্জনে নিমগ্ন হয়েছেন। (তবাকাতুশ শাফিইয়্যাতিল কুবরা, ৫/৫৪)

আল্লামা সুবকী রাহ. যাকে পৃথিবী বিখ্যাত ইমাম বলেছেন তিনি যে আসলেই কত বড় ইমাম ছিলেন তা বলাই বাহুল্য। এ মহান মনীষীর জীবনেও উপরে উল্লেখিত প্রতিবন্ধকতাটি এসেছিল এবং হয়ত তার মাত্রা আমাদের অনেকের চেয়ে বেশি ছিল। তবুও সে প্রতিবন্ধকতা দূর করে তিনি পৌছে গেছেন আকাশের সীমানায়।

ইলম শেখার আগ্রহ সৃষ্টি হওয়ার পর প্রথমে 'র্মাও' এলাকার একজন শায়েখের কাছে যান। তিনি তাকে কিতাবুল মুযানীর এ তিনটি শব্দ প্রথম দিন শেখান-

هذا كتاب اختصرته.

এ পাঠ গ্রহণ করে তিনি ছাদে চলে যান। এশা থেকে ফজর পর্যন্ত এ তিনটি শব্দই মুখস্থ করতে থাকেন। সারা রাত জেগে থাকার কারণে শেষ রাতে একটু চোখ লেগে আসে। তিনি ঘুমিয়ে পড়েন। কিন্তু ঘুম ভাঙতেই মাথায় যেন আকাশ ভেঙ্গে পড়ল। সারা রাত ধরে কী পড়েছেন কিছুই মনে পড়ছে না। তিনি এ কথা ভেবে লজ্জিত হচ্ছিলেন যে, শায়েখকে আমি কী বলব। এ দুশ্চিন্তার মাঝেই হাবুডুবু খাচ্ছিলেন। এমন সময় প্রতিবেশী এক মহিলা বলল-

আবু বকর! গতকাল রাতে هذا كتاب اختصرته বলে বলে তো সারা রাত আমাদের ঘুমাতে দাওনি।

মহিলার অভিযোগভরা কথার মাঝেই তিনি যেন খুঁজে পেলেন হারানো সম্পদ। শায়েখের কাছে গিয়ে সব খুলে বললেন। শায়েখ তখন সান্ত্বনা দিয়ে বলেন, এ কারণে যেন তোমার ইলম শেখার আগ্রহে ভাটা না পড়ে। কারণ তুমি যখন ইলম চর্চায় নিমগ্ন থাকবে এবং সবসময় মুখস্থ করতে থাকবে তখন তা তোমার অভ্যাসে পরিণত হবে।

শায়েখের কথা সত্যি হয়েছিল। কঠিন অধ্যাবসায় ও চেষ্টা-মুজাহাদার মাধ্যমে এমন দুর্বল মুখস্থশক্তির অধিকারী মানুষটিই হয়েছিলেন-

.الإمام الزاهد الجليل البحر أحد أئمة الدنيا

পৃথিবীবিখ্যাত ইমামদের অন্যতম প্রধান। ইলমের সাগর।

আমাদের মধ্যে এমন লোক ক'জন আছে, যে সারা রাত পড়ে মাত্র তিনটি শব্দও মুখস্থ করতে পারে না। তাই বড়দের দ্বীন শিক্ষার ক্ষেত্রে মুখস্থ না হওয়া কিংবা বুঝে না আসা- এ সমস্যার সমাধান একটাই- চেষ্টা, চেষ্টা এবং চেষ্টা।

একটা বাস্তবতা হলো, দুনিয়াবী বিভিন্ন চিন্তা ও ব্যস্ততায় জড়িয়ে থাকলে মানুষের মুখস্ত-শক্তি কমে যায়। ইলমের জন্য ফারাগাত (ব্যস্ততামুক্ত) ও ইনহিমাক (গভীর নিমগ্নতা) থাকা অত্যাবশ্যকীয় শর্ত। কেউ যখন পার্থিব ঝামেলা থেকে মুক্ত হয়ে পূর্ণ নিমগ্নতার সাথে ইলম অর্জন করে আল্লাহ তাআলা তখন তার মেধা খুলে দেন। বয়স্করাও এর থেকে ব্যতিক্রম নন।

আসলে যদি দিলে সাচ্চা ইরাদা ও পোখতা হিম্মত থাকে তাহলে সব কঠিনকেই আল্লাহ তাআলা সহজ করে দেন। আর যদি শত চেষ্টার পরও মুখস্থ না হয় বা না বুঝে আসে তবুও এ চেষ্টার কারণে আল্লাহ তাআলা আজর ও সাওয়াব আমাদের দান করবেন।

বড়দের দ্বীন শিক্ষার দ্বারা এটা বুঝানো হচ্ছে না যে, সবকিছু ছেড়ে দিয়ে এখনই মাদরাসায় ভর্তি হয়ে যেতে হবে; বরং প্রতিদিনের ব্যস্ততার মাঝে কিছু সময় ফারেগ করে আমরা ইলম অর্জন করতে পারি। আমার পরিচিত একজনকে দেখেছি, কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ার হয়েও প্রতিদিন একটু একটু কুরআন মুখস্থ করতে করতে তিনি হাফেয হয়েছেন। আমরাও চাইলে কুরআন মুখস্থ করতে পারি; হাফেয হওয়া সম্ভব না হলে অন্তত কিছু অংশ তো হিফয করতে পারি।

কুরআন বিশুদ্ধভাবে পড়তে শেখা ও প্রয়োজনীয় মাসআলাগুলো জানা- এটা তো একজন মুসলমান হিসেবে আমাদের সবার দায়িত্ব। এর পাশাপাশি আরো কিছু দ্বীনী বিষয়ের জ্ঞানও উলামায়ে কেরামের সাথে পরামর্শ করে শেখা যেতে পারে।

বয়স্কদের দ্বীনী শিক্ষার ব্যাপারে থানভী রাহ. বলেছেন, বর্তমানে লোকদের এত হিম্মত এবং সময়-সুযোগও নেই যে, নিয়মতান্ত্রিকভাবে আলেম হবে। এজন্য দ্বীন শেখা ও শেখানোর এমন একটা সহজ পদ্ধতি বলে দিচ্ছি, যার দ্বারা সাধারণ মানুষ ইলম অর্জনের ফরয দায়িত্ব আদায় করে উভয় জাহানের সফলতা অর্জন করতে পারে। ইলম অর্জনের জন্য পাঁচটি পদ্ধতি অবলম্বন করা যেতে পারে :

১. দ্বীনী বই-পুস্তক পড়া কিংবা অন্যকে দিয়ে পড়িয়ে শোনা।

২. পরিবারের লোকজনদেরকে নিজে পড়ানো কিংবা অন্যকে দিয়ে পড়ানোর ব্যবস্থা করা।

৩. উলামায়ে কেরাম থেকে বিভিন্ন বিষয়ে মাসআলা জিজ্ঞেস করা।

৪. ওয়াজ শোনা।

৫. বিশেষজ্ঞ আলেমদের সোহবতে থাকা।

দ্বীনী বই-পুস্তক পড়ার পদ্ধতি হল, যারা পড়তে পারে তারা ভালো কোনো আলেমের কাছে গিয়ে প্রতিদিন সবক হিসাবে কিছু কিছু পড়বে। যদি এমন কাউকে না পাওয়া যায় তাহলে নিজে নিজেই পড়তে থাকবে। কোথাও বুঝে না আসলে কিংবা অস্পষ্টতা থাকলে পেন্সিল দিয়ে তা দাগ দিয়ে রাখবে। পরবর্তীতে ভালো কোনো আলেমের কাছ থেকে জেনে নেবে। এভাবে যতটুকু ইলম অর্জন হতে থাকবে তা অন্যদেরকেও শেখাবে এবং নিজ ঘরের স্ত্রী-সন্তানদের কেও তালীম দেবে।

যারা পড়তে পারে না তারা পড়াশোনা জানে এমন কারো মাধ্যমে সেসকল কিতাব পড়িয়ে শুনবেন। এর জন্য কোনো খরচের প্রয়োজন হলে সবাই মিলে একটু একটু জমা করে তার ওযিফার ব্যবস্থা করবেন। দুনিয়ার প্রয়োজনে আমরা কত টাকা খরচ করি। দ্বীনের জন্য সামান্য ক'টাকা খরচ করা এমন কোনো কঠিন বিষয় নয়। তবে

পড়ার ক্ষেত্রে নিজে নিজে কিতাব নির্বাচন করবে না; বরং আল্লাহওয়ালা ও যোগ্যতাসম্পন্ন কোনো আলেমের সাথে পরামর্শ করে কিতাব নির্বাচন করতে হবে।
তৃতীয় বিষয় অর্থাৎ মাসআলা জিজ্ঞাসা করার পদ্ধতি হল, দ্বীনী বা দুনিয়াবী কোনো বিষয়ে যখন কোনো কাজ করার প্রয়োজন পড়বে এবং এ ব্যাপারে শরীয়তের মাসআলা জানা না থাকবে তখন সে ব্যাপারে অবশ্যই কোনো আল্লাহওয়ালা আলেম থেকে জিজ্ঞেস করে নিবে। তিনি যা বলে দেবেন তা ভালোভাবে মনে রাখবে এবং অন্যদেরকেও সে বিষয়টি জানাবে। যদি এমন আলেমের কাছে যাওয়ার সুযোগ না হয় তবে তার কাছে চিঠি লিখে সে সম্পর্কে জেনে নেবে।
দ্বীন শেখার এ পদ্ধতি কত সহজ। এ পদ্ধতিতে যদি কেউ দ্বীন শেখা অব্যাহত রাখে তাহলে তেমন কষ্ট ছাড়াই শেখা সম্ভব। -তুহফাতুল উলামা, ৪৩১
সাধারণ শিক্ষিত ও নানা পেশায় নিয়োজিত মুসলিমেরাও কীভাবে প্রয়োজনীয় দ্বীনী জ্ঞান অর্জন করতে পারেন এ বিষয়ে দরদী উলামায়ে কেরামের ফিকির ও মেহনত অব্যাহত ছিল, এখনো আছে। আলহামদু লিল্লাহ, এরই ধারাবাহিকতায় আল্লাহ তাআলার অশেষ মেহেরবানীতে মারকাযুদ দাওয়াহ আলইসলামিয়া ঢাকা-এর তত্ত্বাবধানে শুরু হয়েছে 'তালীমুদ্দীন একাডেমী' নামে একটি নতুন ধারার দ্বীনী প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম।
ছোট থেকে বয়স্ক সর্বস্তরের মানুষের মাঝে দ্বীনী শিক্ষা ছড়িয়ে দেওয়ার একটি ব্যতিক্রমী উদ্যোগ এটি। যারা দ্বীনী শিক্ষা গ্রহণের জন্য নিয়মতান্ত্রিক মাদরাসায় পড়েননি বা পড়ার সুযোগ পান না, তারাও যেন ফরযে আইন পর্যায়ের দ্বীনী শিক্ষা থেকে বঞ্চিত না হন- সেজন্যই এ উদ্যোগ।
আলহামদুলিল্লাহ, এরই মধ্যে তালীমুদ্দীন একাডেমীর এই ধারা কুমিল্লা, সিলেট, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, লালমনিরহাটসহ দেশের বিভিন্ন জেলায় শুরু হয়েছে এবং অল্প সময়ের মধ্যেই সর্বস্তরের সাধারণ মুসলমানদের মাঝে ব্যাপক জনপ্রিয়তা পাচ্ছে।

এছাড়াও অনেক আলেম বিভিন্নভাবে এ মেহনত করে যাচ্ছেন। আপনি চাইলে এগুলোতেও শরীক হতে পারেন।
এছাড়া অনলাইন ভিত্তিক বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান জ্ঞান অর্জনের অন্যতম মাধ্যম হতে পারে। এতে ঘরে বসে জ্ঞান অর্জন করা সম্ভব। শুধুমাত্র দরকার একটু হিম্মত করা, চেষ্টা করা এবং সেই অনুযায়ী চেষ্টা অব্যাহত রাখা।

আল্লাহ তাআলা আমাদের মনে দ্বীন শেখার আগ্রহ দান করুন এবং সকলকে তাওফিক দান করুন- আমীন

■ চতুর্থ অধ্যায় ■

■ ইলম প্রচার- প্রসারের গুরুত্ব:

ইলম শেখার এক ফযীলত আর শেখানোর ভিন্ন ফযীলত। সব কাজের একটি উদ্দেশ্য থাকে, ইলমের উদ্দেশ্য হলো আমল করা। আবার অন্যের নিকট পৌঁছানোও ইলম অর্জনের অন্যতম উদ্দেশ্য। এ ব্যাপারে রাসূল সা. বলেন,

إِنَّمَا بُعِثْتُ مُعَلِّمًا

'আমাকে মুআল্লিম হিসেবে পাঠানো হয়েছে।'

এক. হযরত ওমর রা. বলেন, ইলম শেখো এবং শেখাও। এমনিভাবে মানুষকে ব্যক্তিত্ব ও গাম্ভীর্য শেখাও। আবার যাদের কাছ থেকে ইলম শিখেছ তদের প্রতি বিনয়ী হও, উদ্ধত হয়ো না।
(জামেয়ু বায়ানিল ইলমি ৭৭)

দুই. হযরত আবু হুরায়রা রা. বলেন, تَعَلَّمُوا الْعِلْمَ فَإِنَّ أَحَدًا لَا يُوْلَدُ عَالِمًا.
'ইলম শেখ; কারণ কেউ আলেম হয়ে জন্ম নেয় না।
(ইহইয়াউল উলুম ২৯)

তিন. হযরত আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, রাসূল সা. বলেছেন, مَثَلُ الَّذي يتعلَّمُ العِلمَ ثمَّ لا يُحدِّث به كمَثَلِ الَّذي يكنز الكنز فلا يُنفِقُ منه

'যে নিজে ইলম শিখে কিন্তু অন্যকে শেখায় না সে ওই ব্যক্তির মত যে সম্পদ জমা করে কিন্তু তা থেকে খরচ করে না।(মু'জামে তাবরানী ১/২১৩ন)

চার. হযরত মুয়ায জুহানী রা. থেকে বর্ণিত, রাসূল সা. বলেছেন, مَنْ عَلَّمَ عِلْمًا فَلَهُ أَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهِ لَا يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِ الْعَامِلِ
'যে ব্যক্তি কাউকে ইলম শেখায় আমলকারীর সমপরিমাণ সওয়াব সেও পাবে, তবে আমলকারীকে তার সওয়াব কোনো অংশে কম দেয়া। (ইবনে মাজা ২৪০)

পাঁচ. হযরত ফুযাইল ইবনে গাযওয়ান বলেন,

لا تَمْنَعِ الْعِلْمَ مِنْ أَهْلِهِ فَتَأْثَمَ وَلَا تُنْشِره عِنْدَ غَيْرِ أَهْلِهِ فَتَجْهَلَ وَكُنْ طَبِيبًا رَفِيقًا يَضَعُ دَوَاتَهُ حَيْثُ يَعْلَمُ أَنَّهُ يَنْفَعُ .
'যোগ্য লোককে ইলম না শেখানো গোনাহ। আবার অযোগ্যকে ইলম শেখানো মূর্খতা। তোমাদের হতে হবে বিচক্ষণ ডাক্তার। ডাক্তার যেখানে সুস্থতার সম্ভাবনা দেখে ঔষধ লাগায়। (জামেয়ু বায়ানিল ইলমিঃ)
সুতরাং তোমাদেরও জানতে হবে কাকে কী পরিমাণ শেখাতে হবে।

ছয়. হযরত লোকমান হাকিম তার সন্তানকে লক্ষ্য করে বলেন, 'হে বৎস, এ উদ্দেশ্যে ইলম শিখবে না যে, আলেমদের সঙ্গে বিতর্ক করবে, মূর্খদের সঙ্গে গর্ব করবে। অথবা সভা-সমাবেশে ইলম জাহের করে বেড়াবে।

ইলম-চর্চায় অবহেলা করবে না, মূর্খদের সঙ্গে মিশবে না, বরং আলেমদের সঙ্গে থাকবে। কোনো দলকে আল্লাহর জিকির করতে দেখলে তাদের সঙ্গে বসবে। কারণ তুমি আলেম হলে এতে তোমার উপকার হবে। আর মূর্খ হলে কিছু শেখা হবে। তাদের ওপর রহমত নাযিল হলে তুমিও পাবে রহমতের কিছু অংশ। যারা আল্লাহর জিকির করে না তাদের সঙ্গে বসবে না। কারণ তুমি আলেম হলে মূর্খদের সংশ্রবে তোমার ইলম ব্যর্থ হয়ে যাবে। আর মূর্খ হলে তোমার মূর্খতা বাড়বে। আবার তাদের ওপর কোনো শাস্তি হলে তা তোমার ওপরও নেমে আসবে। (জামেয় বায়ানিল ইলমি।)

সাত. হযরত মুজাহিদ রহ. বলেন,

لا يَتَعَلَّمُ الْعِلْمَ مُسْتَحْيِ وَلَا مُسْتَكْبِرُ

'অতিলাজুক ও অহংকারী ইলম শিখতে পারে না। (আল মাজমু'।)

আট. হযরত মুয়ায রা. বলেন,

تَعَلَّمُوا العِلْمَ فَإِنَّ تَعَلَّمَه حَسَنَةٌ وَطَلَبَه عِبَادَةٌ وَ مُذَاكِرَتَه تَسْبِيحُ وَالْبَحْثَ عَنْه جِهَادُ و بَذْلَهُ قُرْبَةٌ و تَعْلِيمَه مَنْ لَا يَعْلَمُه صَدْقَةٌ .

'তোমরা ইলম শেখ। কেননা ইলম শেখা নেক কাজ, তা অন্বেষণ করা ইবাদত। ইলমের মুযাকারা তাসবীহতুল্য। ইলমী আলোচনা জিহাদতুল্য। ইলম শেখানো সদকাতুল্য। আর যার ইলম নেই তাকে শেখানো সদকাতুল্য। (তাযকিরাতুস সামে' ২১)

তিনি অন্যত্র বলেন,

الْعِلْمُ بِالتَّعَلُّمِ وَالْحِلْمُ بِالتَّحَلُّمِ

'ইলম আসে চর্চা-অনুশীলনে আর হেলেম আসে ধৈর্য ও সহনশীলতায়।' প্রকৃত ইলমের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের হেলেমও বৃদ্ধি পায়।

তিনি আরো বলেন,

لا يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَا آتَاهُمُ الْعِلْمُ مِنْ أَصْحَابِ رَسُوْلِ اللَّهِ وَ مِنْ أَكَابِرِهِمْ فَإِذَا جَاءَ الْعِلْمُ مِنْ قِبَلِ أَصَاغِرِهِمْ فَذَلِكَ حِيْنَ هَلَكُوا .

'যতদিন পর্যন্ত মানুষ সাহাবী ও তাদের পরবর্তীদের থেকে ইলম শিখেছে তাদের অবস্থা ভালো ছিল। পরে যযখন ছোটদের থেকে ইলম শিখতে শুরুকরল তখনই ফ্যাসাদ দেখা দিল।'

অনেকে বলেন,

الْبَرَكَةُ مَعَ أَكَابِرِكُمْ

'বড়দের সঙ্গে থাকে বরকত।

আজকাল লোকে ইন্টারনেট ঘেঁটে ইলম শেখে। পরে সে অনুযায়ী আমল শুরু করে দেয়। কারো কাছ থেকে শেখার প্রয়োজন বোধ করে না। এতে প্রায়ই ফেতনা-ফাসাদ ছড়ায়।

■ তালিবে ইলমের কতিপয় গুণাবলী:

নিয়ত সহিহ রাখা:

সহীহ নিয়তে ইলম অর্জন করবে-আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টির নিয়তে, আমলের নিয়তে, দ্বীন ও শরীয়তের পুনর্জীবনের নিয়তে। অন্তরকে আলোকিত করা, বাতেনকে সুসজ্জিত করা এবং কেয়ামতের দিন আল্লাহর নৈকট্য লাভের নিয়তে ইলম শিখবে।

)رواه الحاكم وصححه على شرطهما ووافقه الذهبي ( ]83[

হযরত সুফিয়ান সাওরী বলেন, নিয়তের চেয়ে কঠিন কোনো বিষয়ের মুখোমুখি আমি হইনি। এমন নিয়ত করতে হবে যাতে দুনিয়ার কোনো স্বার্থ থাকে না; পদ-পদবি ও অর্থবিত্তের লোভ থাকে না। আবার সাথীদের উপর শ্রেষ্ঠত্ব লাভ বা সম্মান প্রাপ্তির

উদ্দেশ্য থাকে না। ভালো কাজের বিনিময়ে মন্দ পেয়েও খুশি থাকে। (তাযকিরাতুস সামে' ৭২)

ইমাম নববী রহ. লেখেন, তালিবে ইলম স্বীয় ইলমের মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টি কামনা করবে। দুনিয়াবী কোনো পদ-পদবী, অর্থবিত্ত, সুনাম-সুখ্যাতি, সাথীদের উপর শ্রেষ্ঠত্ব লাভ বা অধিক ছাত্রের সমাগম সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী রহ. লেখেন, ইলমকে আল্লাহ পাক শুরু থেকেই দুঃখ-কষ্ট ও ধৈর্য ও সহিষ্ণুতার সঙ্গে জড়িয়ে রেখেছেন। সুউচ্চ হিম্মত, সুদঢ় মনোবল, ইলমী গাইরত, দুনিয়া-বিমুখিতা, মিতব্যয়িতা, রাত্রি-জাগরণ, সাধনা-মুজাহাদা, দোয়া-মুনাজাত, ইলমী সফর, ইলমের উৎস-সন্ধান, যোগ্য উস্তাদ তালাশ করা; তাদের প্রতি বিনয় ও আনুগত্য প্রদর্শন, তাদের সম্মান করা এবং শুকর করা-এসব তালিবে ইলমের অপরিহার্য গুণাবলী। (সাফাহাত মিন সাবরিল উলামা ১৩।)

তালিবে ইলমের উচিত আত্মাকে সর্বপ্রকার হিংসা-বিদ্বেষ ও ধোঁকা-প্রতারণা থেকে পবিত্র রাখা। যাবতীয় ভ্রান্ত-আকীদা ও বদঅভ্যাস থেকে মুক্ত থাকা; যাতে আত্মা ইলম গ্রহণের উপযুক্ত হয় এবং ইলমের নিগূঢ় রহস্য উন্মোচিত হয়। কেননা ইলম বাতেনী ইবাদত। জাহেরী ইবাদত নামায যেমন জাহেরী তাহারাত ছাড়া হয় না, তেমনি বাতেনী ইবাদত ইলমও বাতেনী তাহারাত ছাড়া হবে না। (তাযকিরাতুস সামে' ৭২)

তালিবে ইলমগণ নফল ইবাদত ও কুরআন তেলাওয়াতে পাবন্দি করবে। জবানে ও অন্তরে সদা আল্লাহ পাকের জিকির জারি রাখবে। হাদীস-কুরআনে বর্ণিত দোয়াগুলো পড়বে। রাতদিন নফল নামায, রোজা ও দুরুদ জারি রাখবে।

মানুষের সঙ্গে সদাচার করবে। হাসিমুখে থাকবে। সালাম দেবে। খানা খাওয়াবে। রাগ-গোস্বা হজম করবে। মানুষকে কষ্ট দেবে না। তাদের বোঝা বহন করবে। নিজে ভোগ না করে অন্যের জন্য ত্যাগ স্বীকার করবে। জুলুম করবে না, বরং ইনসাফ করবে। শুকরিয়া আদায় করবে। মানুষকে আরাম পৌছানোর চেষ্টা করবে। তাদের প্রয়োজন মেটাবে। গরীব-দুঃখীর প্রতি সদয় থাকবে। পাড়া-প্রতিবেশীদের সঙ্গে

ভালোব্যবহার করবে। সাথীদের সঙ্গে বিনম্র আচরণ করবে। তাদের সাহায্য-সহযোগিতা করবে। (তাযকিরাতুস সামে'।)

অল্পেতুষ্টি:

ইলম অর্জনের পথে যা ভাগ্যে জোটে তাই খেয়ে সন্তুষ্ট থাকবে; হোক না কেন। পরিধানের জন্য যা পাওয়া যাবে তাই পরবে; পুরানো হোক না কেন। দারিদ্রে ধৈর্য ধারণ করলে ইলমে গভীরতা আসে। পার্থিব অভিলাষ ও উচ্চাশা থেকে অন্তরকে গুটিয়ে নেবে তাহলে অন্তরে ইলম ও হিকমতের ঝরনা প্রবাহিত হবে। (তাযকিরাতুস সামে' ৭৪)

শোরগোল থেকে দূরে থাকা:

তালিবে ইলমের জন্য শোরগোল থেকে দূরে থাকা আবশ্যক। কেননা নির্জনতা ও একাকিত্ব চিন্তার স্বচ্ছতার পক্ষে সহায়ক। চিন্তা-ফিকির স্বচ্ছ হলে বিষয়বস্তু সহজে আত্মস্থ হয়। ইলম তো হাসিল হয় চিন্তা-ফিকিরের সাহায্যে। আর চিন্তা-ফিকির খুবই স্পর্শকাতর; সামান্য শোড়গোলে তা ব্যহত হয়।

তাই জটিল কঠিন ও সূক্ষ্ম ইলম অর্জনে স্থান-কালের গুরুত্ব অপরিসীম। তাতে সঠিক বুঝ ও সমঝ অর্জন হয়। (কিমাতুয যমান ১৮৮ পরিমার্জিতা।)

নেযামুল আওকাত:

তালিবে ইলমের সব কাজ রুটিন মাফিক হওয়া চাই। খাওয়া-দাওয়া, ঘুম-বিশ্রাম, অজু-গোসল, ইবাদত-বন্দেগি, পড়ালেখা সবই হওয়া চাই নিয়মমাফিক। তাহলেই সে পৌঁছতে পারবে কাঙ্ক্ষিত গন্তব্যে। সববিষয়ে গড়ে উঠবে পরিপক্ক হয়ে। অন্যথায় কোনো কোনো বিষয় কাঁচা থেকে যাবে।

এ ব্যাপারে ইমাম ইবনুল জাওযী তার বিখ্যাত গ্রন্থ সাইদুল খাতির এ লেখেন, তালিবে ইলমের উচিত সবটুকু সময় মুখস্থ করা ও তাকরারে ব্যয় করা। এতেই সবিশেষ মনোযোগ দেয়া। তবে শরীর-স্বাস্থ্যও একটা বাহন, তাতে অসাধ্য কিছু

চাপালে বিগড়ে যেতে পারে। সে বিষয়ে যত্নবান থাকতে হবে। তবে একঘেয়েমিতে মানুষের শক্তি-সাহস ও উদ্যম-মনোবল স্থবির হয়ে যায়, তাই নতুনত্ব প্রয়োজন। নতুনত্ব সৃষ্টির লক্ষ্যে প্রতিটা কাজ করবে রুটিনমাফিক পড়ালেখা, তাকরার-মুযাকারা ও ঘুম-বিশ্রাম সব। সকাল ও সন্ধ্যা বরাদ্দ রাখবে কিছু মুখস্থ করতে। বাকি সময় পড়াশোনা, লেখালেখি ও বিশ্রামের জন্য রাখবে। (সাফাহাত ও সাইদুল খাতের ২৮৯)

আল্লামা বুরহানুদ্দীন জারনুজী রহ. বলেন, তালিবে ইলমের উচিত প্রতিটা মুহূর্তকে কাজে লাগানো, যাতে সে মর্যাদা লাভ করতে পারে। সময় কাজে লাগানোর সহজ পদ্ধতি হলো, সবসময় নিজের সঙ্গে কাগজ কলম রাখবে, যাতে মূল্যবান কিছু শুনলে লিখে রাখা যায়। কেননা কথায় বলে, যা মুখস্থ করা হয় ভেগে যেতে চায়, আর যা লেখা হয় স্থায়ী থাকে।

কেউ কেউ বলেন, ইলম হলো যা উস্তাদের মুখ থেকে শোনা যায়। কেননা তারা জরুরী বিষয়টা মুখস্থ রাখেন। আবার যা মুখস্থ রাখেন তন্মধ্যে শ্রেষ্ঠ বিষয়টা বলেন। সর্বদা সঙ্গে একটা কিতাব রাখবে মোতালায়া করতে। শোনা যায়, যার হাতায় কিতাব থাকে না তার ইলম পাকা হয় না। সঙ্গে খাতা কলম রাখবে যাতে উস্তাদের কাছে শোনা বিষয় লেখা যায়।

সবর ও তাওয়াক্কুল:

সবর ও তাওয়াক্কুল তথা ধৈর্য ও আল্লাহ পাকের প্রতি নির্ভরতা তালিবে ইলমের প্রধান গুণ। বিশেষত বর্তমানের ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ সময়ে সবর ও তাওয়াক্কুলের বিকল্প নেই। এছাড়া লেখাপড়ায় মনোযোগ ধরে রাখা যায় না। ভবিষ্যতের ভাবনা ও পার্থিব উন্নতির চিন্তা মনকে অস্থির করে তোলে। যদি অর্থ উপার্জনের ফিকিরে লেগে যাও আর যাই হোক তোমার ইলম অর্জন হবে না। ইলম দাবী করে অখণ্ড মনোযোগ ও নিরবচ্ছিন্ন সাধনা। তখন অন্যদিকে মনোযোগ দেয়ার অবকাশ থাকে না। পূর্ণ আত্মসমাহিত হয়ে ইলমের জন্য সর্বস্ব বিলিয়ে দিলে তুমি পাবে সামান্য কিছু ইলম। বাইরের চাকচিক্য ও প্রযুক্তির ধাঁধায় যদি ধাঁধিয়ে যায় তোমার চোখ, সর্বদা উদ্বেগ-

উৎকণ্ঠা লেগে থাকে, কী হবে আমার? সবাই তো চাকরি-বাকরি, ব্যবসা-বাণিজ্য করে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাচ্ছে, আমি কী করবো? আমার ভবিষ্যত তো অন্ধকার! এসব চিন্তায় ডুবে গেলে তোমার ইলম অর্জন হবে না।

ভবিষ্যত আসলে আল্লাহর হাতে। আল্লাহ পাকই কারো ভবিষ্যত গড়েন, কারো ভবিষ্যত ভাঙ্গেন। তোমার ভবিষ্যতের জিম্মাদার যখন আল্লাহ তাআলা তখন আর চিন্তা কী! আল্লাহর প্রতি একান্ত ভরসায় গভীর সাধনায় আত্মনিমগ্ন হও। তারপর দেখো কী হয়! ইমাম আবু হানিফা আব্দুল্লাহ ইবনে হাসান যুবাইদীর সূত্রে বর্ণনা করেন, যে দ্বীনের তাফাক্কুহ অর্জন করে আল্লাহ পাক তার সকল দায়িত্ব নিজে নিয়ে নেন এবং তাকে অকল্পনীয়ভাবে রিজিক দেন।

(তা'লীমুল মুতাআল্লিম।)

পার্থিব সম্পর্কে জড়াবে না:

ইলমের জন্য অখণ্ড মনোযোগ কাম্য; সবকিছু থেকে সম্পর্কোচ্ছেদ। আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধব সবকিছু ছাড়তে হবে। তাই বলে একেবারে ছেড়ে দেয়ার কথা বলছি না। অন্তত মাদরাসার সময়টুকু তুমি নির্বিঘ্ন কাটাবে। ছুটিতে বেড়াতে যাও, দোষের কিছু নেই। পকেটে যদি থাকে মোবাইল আর মোবাইলে তাকে ইন্টারনেট সংযোগ, সারা দুনিয়ার হাসি-কান্না ও আনন্দ-বেদনায় তুমি অংশীদার হও; কার বিয়ে হলো, কার খতনা হলো, কার আকিকা হলো, কার দাদী মারা গেলো, কোথায় কোন দুর্ঘটনায় কতজন হতাহত হলো; চব্বিশ ঘণ্টার আপডেট খবর যদি জানতে চাও, তাহলে আর যাই হোক তোমার ইলম অর্জন হবে না। আবার ফেসবুক, ইউটিউবের খপ্পরে পড়লে তো কথাই নেই, লেখাপড়া তোমার লাটে উঠবে। অনেকে যুক্তি দেখায় ইন্টারনেটে কত কিছু পাওয়া যায়, সেখানে জানার আছে কত কিছু! বলি, আগে কিতাবের পাতা থেকে ইলম উদ্ধার করতে শেখ। পরে না হয় ইন্টারনেটের অথৈ সাগরে সাঁতার কাটবে। অন্যথায় সেখানেও থৈ পাবে না। ফ্যাশনেবল জামা, লেটেস্ট মডেলের মোবাইল, নিত্য-নতুন প্রযুক্তির ব্যবহার-এসব চিন্তায় যারা বিভোর থাকে তাদের ইলম অর্জন হয় না।

দারসের আদব:

হযরত ফুযাইল ইবনে ইয়ায রহ. দ্বীনী ও ইলমী মজলিসে অংশ-গ্রহণকারীদের উদ্দেশে পাঁচটি নসিহত করেছেন। নসিহতগুলো মূলত ইলমের জন্য পাঁচটি সিঁড়িস্বরূপ। এগুলো অতিক্রম করে তালিবে ইলম মানযিলে মাকসাদে উপনীত হয়। সেগুলো হলো-

১. সবকে প্রথম কাজ হলো শোনা। উস্তাদের কথা মনোযোগ দিয়ে শ্রবণ করা। মনপ্রাণ ও দিল-দেমাগ হাজির রেখে গভীর অভিনিবেশ সহকারে শোনা।
শোনার আদর্শ পদ্ধতি হলো, উস্তাদ যখন তাকরীর করেন দৃষ্টি রাখা উস্তাদের দিকে। কেননা অনেক সময় উস্তাদের হাত ও চোখের ইশারায় অনেক কিছু বুঝে আসে। ইবারতের অর্থ ও মতলব বলার সময় আঙ্গুল রাখা ইবারতের ওপর।

২. দ্বিতীয়ত চুপ থাকা। কোনো প্রকার কথাবার্তা, নড়াচড়া বা ইশারা-ইঙ্গিত না করা। হাত-পা, দাড়ি-টুপি নিয়ে না খেলা, বরং গভীর মনোযোগ সহকারে তাকরীর শোনা।

সাহাবায়ে কেরামের ব্যাপারে শোনা যায়, তারা যখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মজলিসে বসতেন, এমন নিশ্চুপ ও অনড় থাকতেন যে, মনে হতো তাদের মাথায় পাখি বসেছে; একটু নড়লেই উড়ে যাবে।

৩. তৃতীয়ত মুখস্থ করা। উস্তাদের তাকরীর যেনো হাওয়ায় মিলিয়ে না যায়, তাই মুখস্থ করে নেয়া।মুখস্থ রাখার পদ্ধতি দু'টি।

প্রথমত স্মৃতিতে ধরে রাখার প্রাণান্ত চেষ্টা করা। কারণ স্মৃতিশক্তির ব্যবহার যতো করা যায় ততোই তা প্রখর ও শাণিত হয়।

মাওলানা মানাযের আহসান গিলানী বলেন, মানুষের অবস্থা বড়ই বিচিত্র। কানের ওপর তার আস্থা আছে; কানের ব্যবহার সে করে।

চোখের ওপর তার ভরসা আছে; চোখও সে ব্যবহার করে। হাতের শক্তির ওপর তার বিশ্বাস আছে; সেটাও সে ব্যবহার করে। সর্বোপরি তার তো স্মৃতিশক্তিও আছে; এটার ওপর তার ভরসা নেই কেন? এর ব্যবহার সে করে না কেন? ব্যবহারেই কোনো জিনিস ধারালো হয়, শাণিত থাকে। মানুষ সাধারণত স্মৃতিশক্তির যথার্থ ব্যবহার করে না। এজন্যই কানেপড়া কথা দ্রুত উধাও হয়ে যায়। মূলত যেসব বিষয় স্মৃতিতে ধরে রাখার চেষ্টা করা হয় সেসব বিষয় অনায়াসে মনে থাকে।

মাওলানা থানভী রহ. মানুষের নাম দ্রুত ভুলে যেতেন। একই ব্যক্তির নাম বারবার জিজ্ঞাসা করতেন। কেউ জিজ্ঞাসা করল, হযরত! আপনার স্মৃতিশক্তি তো দুর্বল নয়। দ্বীনী কত বিষয়, মাসআলা-মাসায়েল, তাফসীর ও হাদীসের কত নোকতা, কত রকমের ঘটনা আপনার মুখস্থ। কলম ও জবান যখন খুলে দেন স্রোতের মত বেরুতে থাকে। তাহলে মানুষের নাম এত দ্রুত ভুলে যান কেন? হযরত বলেন, তুমি ঠিকই বলেছ, আমার স্মৃতিশক্তি যেহেতু ইলমী বিষয়ে ব্যবহার করি, তাই ইলমের সঙ্গে স্মৃতিশক্তির একটা সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। ফলে এসব বিষয় সহজে মনে থাকে। নামের সঙ্গে যেহেতু স্মৃতির সম্পর্ক গড়ে ওঠেনি, তাই নাম দ্রুত ভুলে যাই। অভিজ্ঞতা ও বুযুর্গদের কথায় এটাই প্রতীয়মান হয় যে, যারা গোনাহ ও অশ্লীলতা থেকে বেঁচে থাকে, তাকওয়া-পরহেযগারী অবলম্বন করে, তাদের স্মৃতিশক্তি হয় প্রখর। আর গোনাহ ও অশ্লীলতায় যারা যত বেশি লিপ্ত স্মৃতিশক্তি তাদের তত বেশি দুর্বল।

স্মরণ রাখার দ্বিতীয় পদ্ধতি হলো, শোনা বিষয় লিখে রাখা এবং বারবারস্মরণ রাখার দ্বিতীয় পদ্ধতি হলো, শোনা বিষয় লিখে রাখা এবং বারবার তা দেখতে থাকা, যেন স্মৃতিতে গেঁথে যায়। আজকাল আমরা দুনিয়ার সাধারণ বিষয়ের জন্য নোটবুক রাখি, কিন্তু মোতালায়ায় পড়া, সবকে বা ওয়াজে শোনা কোনো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নোট করার তেমন প্রয়োজন অনুভব করি না। দ্বীনী নোটবুক রাখা চাই, যাতে দ্বীনের গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নোট করা যায়। স্মরণ রাখার এটাও একটা পদ্ধতি যে, শোনা কথা তাকরার তথা পুনরুক্তি করা। স্মরণ রাখার সবচেয়ে কার্যকর পদ্ধতি হলো, করণীয় বিষয় হলে সঙ্গে সঙ্গে আমল শুরু করে দেওয়া। স্মরণ রাখার এরচে' কার্যকর কোনো পদ্ধতি হতে পারে না। যেমন খাওয়া, শোয়া, অজু, ইস্তেঞ্জা সম্পর্কিত কোনো আদব বা

সুন্নাত শোনার সঙ্গে সঙ্গে আমল শুরু করে দেওয়া। এতে ইলম যেমন তাজা থাকে, আমলও থাকে সজীব।

৪. চতুর্থ বিষয় হলো আমল করা। দ্বীনী কথা শোনার পর এর ওপর আমল করা জরুরী। ইমাম রেফায়ী রহ. বলেন, এমন যেন না হয় ইলমের মজা তো চেখে নিলে, কিন্তু আমলের তিক্ততা ছেড়ে দিলে।

৫. পঞ্চম বিষয় হলো, ইলমের প্রচার-প্রসার করা। একজন আলেমের দায়িত্ব শুধু নিজেকে সংশোধন করাই নয়, বরং ইলমের প্রচার-প্রসার ও অন্যদের সংশোধনের দায়িত্বও তার ওপর। (১৫৫)

সবকে বুঝে না এলে জিজ্ঞাসা করে নেয়া প্রসঙ্গ:

কিতাবের কোনো ইবারত বুঝে না এলে আদবের সঙ্গে সবকেই উস্তাদকে জিজ্ঞাসা করে নেবে। সবকে সুযোগ না হলে অন্য কোনো সময় উস্তাদের কাছে গিয়ে বুঝে নেবে।

হাদীসে এমন অনেক ঘটনা পাওয়া যায় যে, সাহাবায়ে কেরাম নিজেদের গোপন সমস্যা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞাসা করতেন, আর তিনি অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবে জবাব দিয়ে তাদেরকে পরিতৃপ্ত করে দিতেন। কোনো মহিলা সাহাবী না বুঝলে উম্মুল মু'মিনীন হযরতআয়েশা তাকে বুঝিয়ে দিতেন।

হযরত আয়েশাও রাসূল সা.-এর কোনো কথা না বুঝলে বারবার জিজ্ঞাসা করে বুঝে নিতেন। একবার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, 'যার হিসাব নেয়া হবে তার শাস্তি অনিবার্য।' হযরত আয়েশা রা. জিজ্ঞাসা করেন, আল্লাহ তাআলা কি বলেন নি-

فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتٰبَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا

'যার ডান হাতে আমলনামা দেওয়া হবে তার হিসাব নেয়া হবে সহজভাবে। (সুরা ইনশিকাক ৭-৮)
জবাবে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

إِنَّمَا ذَلِكَ الْعَرْضُ، وَلَكِنْ مَنْ نُوقِشَ الْحِسَابَ يَهْلِكْ

'এটা তো (প্রকৃতপক্ষে হিসাব নেয়া নয়) পেশ করা মাত্র। অন্যথায় যার পুঙ্খানুপুঙ্খ হিসাব নেয়া হবে তার শাস্তি অনিবার্য।
(বুখারী ১০৩)

বোঝা গেলো, উস্তাদের কথা বুঝে না এলে জিজ্ঞাসা করে নেয়া উচিত যেমন হযরত আয়েশা রা. বুঝে নিতেন।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. বলেন, রাসূল সা.-এর ইন্তিকালের পর আমি এক আনসারী সাথীকে বললাম, চলো, রাসূলের সাহাবী অনেকে বেঁচে আছেন, তাদের কাছে যাই, ইলম হাসিল করি। সাথী বিস্ময়ভরা কণ্ঠে বলে উঠলো, হে ইবনে আব্বাস, বলো কি! এতো বড় বড় সাহাবী থাকতে তুমি কি মনে করো কেউ তোমার কাছে আসবে? ইবনে আব্বাস বলেন, সাথী গেলো না। আমিই গেলাম সাহাবীদের দ্বারে দ্বারে। গিয়ে হাদীস শিখতে লাগলাম। কেউ কোনো হাদীস জানে শুনলে তার বাড়িতে গিয়ে বসে থাকতাম। গিয়ে হয়ত শুনতাম, তিনি বিশ্রাম করছেন। আমি দরজায় চাদড় মুড়ি দিয়ে পড়ে থাকতাম। অনেক সময় লু হাওয়ার ঝাপটায় কষ্ট হতো। তবুও বসে থাকতাম ধৈর্য সহকারে। একসময় সাহাবী বের হয়ে আসতেন। আমাকে দেখে বলতেন-হে ইবনে আব্বাস! তুমি কেন এসেছো? আবার এখানে পড়ে আছো কেন? খবর পাঠালেই পারতে? বলতাম, আমার প্রয়োজনে তো আমারই আসা উচিত। পরে তার কাছে হাদীস জিজ্ঞাসা করতাম। পরবর্তীতে সে আনসারী সাথী দেখতো, আমার পাশে লোকেরা ভিড় করে মাসআলা জিজ্ঞাসা করছে। তিনি তখন আফসোস করে বলতেন, আসলেই ইবনে আব্বাস আমার চেয়ে বুদ্ধিমান।(আল জামে' লি আখলাকির রাবী ৬১। আল বেদায়াত ওয়ান নেহায়া ৮/৩)

বুঝে না এলে জিজ্ঞাসা করে নেয়া প্রসঙ্গে আকাবিরের কয়েকটি ঘটনা:

১. আমাদের আকাবির মাওলানা এজায আলী রহ. সম্পর্কে বর্ণিত আছে, যখনই কোনো কিছু জিজ্ঞাসা করার প্রয়োজন হতো বা কিতাবের কোনো ইবারত বুঝে না আসতো সোজা গিয়ে বসে যেতেন আল্লামা আনওয়ার শাহ কাশ্মিরী রহ.-এর দরজায়। তিনি ঘর থেকে বের হলে জিজ্ঞাসা করে নিতেন। এমনটা প্রায় প্রতিদিন ঘটতো।

২. মুফতী আ'জম পাকিস্তান মাওলানা মুহাম্মাদ শফী রহ. বলেন, দারুল উলুম দেওবন্দে যখন 'মোল্লা হাসান' পড়ি, একবার এক ইবারতে কিছুটা খটকা লাগল, যা কোনোভাবে হলো হচ্ছিল না। ভাবলাম, হযরত কাশ্মিরী সাহেবের কাছে জিজ্ঞাসা করতে হবে। সুতরাং তার তালাশে বের হলাম। তিনি তখন কামরায় ছিলেন না। আর কামরায় না থাকা মানে কুতুবখানায় থাকা সুনিশ্চিত। সেমতে কুতুবখানায় গেলাম। তিনি তখন উপরের বারান্দায় বসে মোতালায়া করছিলেন। আমি নিচে থাকতেই দেখে ফেলেন। আসার কারণ জিজ্ঞাসা করলে বললাম, মোল্লা হাসানের এক জায়গায় কিছুটা খটকা লেগেছে, বুঝতে পারছি না। তিনি ওপর থেকে বললেন, ইবারত পড়ো। ইবারত পড়া শুরু করলে তিনি মাঝখানে থামিয়ে দিয়ে বলেন, এখানে হয়ত তোমার এই খটকা লেগেছে। পরে হুবহু সেই সন্দেহ তুলে ধরেন যা আমার মনে জেগেছে। বললাম, হ্যাঁ, এই সন্দেহ। তিনি তখন সেখান থেকে এমন তাকরীর পেশ করেন যে, আমার সন্দেহ দূর হয়ে গেলো। (আকাবিরে দেওবন্দ কিয়া থে ৪২।)

৩. মুফতী মুহাম্মাদ শফী রহ.-এর পিতা মাওলানা ইয়াসিন রহ. মানতেক বা উসূলে ফেকাহের কোনো কিতাব কোনো কারণবশত পড়তে পারেননি। ভাবলেন, দাওরায়ে হাদীস শুরু করার আগে কিতাবখানি পড়ে নেবেন। পরে তিনি মোল্লা মাহমুদ সাহেবের কাছে আবেদন করেন কিতাবখানি পড়িয়ে দিতে। তিনি জবাবে বলেন, মাদরাসার নির্দিষ্ট সময় ছাড়াও আমার সবটা সময় সবকে কাটে। তবে যখন সওদা করতে বাজারে যাই তখন একটু ফুরসত আছে। তুমি সঙ্গে থেকে সেটুকু সময়ে কিছু পড়ে নিতে পার। মাওলানা ইয়াসিন সাহেব বলেন, কিতাব ছিল বেশ জটিল। অন্যরা

যেখানে গভীর মোতালায়া করেও পড়াতে হিমশিম খেতো, তিনি অনায়াসে পড়িয়ে দিলেন কিছু রাস্তায়, কিছু তরকারির দোকানে। এমনভাবে পড়ালেন যে, কঠিন মনে হয়নি। (আকাবিরে দেওবন্দ কিয়া থে ৯৯।)

৪. দারুল উলূম দেওবন্দের শিক্ষক মাওলানা আব্দুস সামী সাহেবের ব্যাপারে শোনা যায়, যখনই কোনো মাসআলা বুঝে না আসতো বা ছাত্ররা প্রশ্ন করে আটকে দিতো সোজা চলে যেতেন মাওলানা ইবরাহিম বালইয়াবীর কাছে বা অন্য কোনো উস্তাদের কাছে। গিয়েইবরাহিম বালইয়াবীর কাছে বা অন্য কোনো উস্তাদের কাছে। গিয়ে বুঝে এসে ছাত্রদের নিঃসংকোচে বলে দিতেন, অমুকের কাছে থেকে বুঝে আসলাম।

৫. মাওলানা এজায আলী রহ.-এর অবস্থাও ছিল অনুরূপ। যখনই কোনো ইবারত বুঝে না আসতো সোজা চলে যেতেন দারুল হাদীসে মাওলানা হোসাইন আহমদ মাদানীর কাছে। এবং দরস চলাকালে উপস্থিত ছাত্রদের সামনে জিজ্ঞাসা করে চলে আসতেন।

৬. মাওলানা আসাদুল্লাহ সাহেবের অবস্থাও ছিল অনুরূপ। যখনই কোনো মাসআলা বুঝে না আসতো কিতাব নিয়ে সোজা মাওলানা খলীল আহমদ সাহারানপুরীর নিকট চলে যেতেন।

এ সকল উলামায়ে কেরাম যদি লজ্জা-শরমের কারণে বা অহংকারবশত জিজ্ঞাসা না করতেন তাহলে আজ জগদ্বিখ্যাত আলেম হতে পারতেন না। বিনয় তাওয়াজু তাদেরকে কোথায় পৌঁছে দিয়েছে!

জিজ্ঞাসা করতে লজ্জা বোধ না করা:

হাদীস শরীফে এসেছে,

فَإِنَّمَا شِفَاءُ الْعِيِّ السُّؤَالُ

'অপারগ ব্যক্তির চিকিৎসা হলো জিজ্ঞাসা করা।
(আবু দাউদ ৩৩৬।)

অতএব কোনো ইবারত বুঝে না এলে জিজ্ঞাসা করতে লজ্জা পাওয়া উচিত নয়। লজ্জা-শরম ত্যাগ করে, মনকে শক্ত করে, অত্যন্ত বিনয় ও নম্রতার সঙ্গে জিজ্ঞাসা করে বুঝে নেবে। যাতে হৃদয় প্রশান্ত হয়। যারা জিজ্ঞাসা করতে লজ্জা পায় তারা ইলম থেকে বঞ্চিত হয়।

এ ব্যাপারে মসলেহুল উম্মাত মাওলানা শাত অসিউল্লাহ সাহেবের কথাপ্রণিধানযোগ্য। তিনি বলতেন, এতদিন পর এই বৃদ্ধ বয়সে-যখন কোনো কিছু শেখার সময় নেই-এ সত্য বুঝে এলো যে, মানুষের শ্রেষ্ঠত্বের পথে সবচেয়ে বড় বাধা তার অহংকার। এই অহংকার তাকে কোনো যোগ্য ব্যক্তির কাছে নত হতে দেয় না। অন্যথায় আহলে কামাল থাকে প্রত্যেক যুগে, যাদের কাছ থেকে যোগ্যতা অর্জন করা যায়। কিন্তু লজ্জা-শরম ও অহংকারের কারণে তাদের সামনে মাথা নত করে না। ফলে কিছু অর্জনও হয় না, অন্ধ থেকে যায়। মানুষ যখন নিজের গর্ব-অহংকার ছাড়তে পারে তখনই কিছু অর্জন করতে পারে।

কারণ প্রবাদ আছে,

هر كجا پستست اب انجارود 'পানি ঢালু জায়গায় গড়ায়।'

হযরত মুজাহিদ রহ. বলতেন,

إنَّ هذا العلم لا يتعلمه مستحي ولا متكبر

'এই ইলমে দ্বীন অতিলাজুক ও অহংকারী অর্জন করতে পারে না। (হিলইয়াতুল আউলিয়া ১৩৪২) কেননা এ দু'টি স্বভাব এমন, যা অন্যের কাছে নত হতে দেয় না। ফলে সে মূর্খই থেকে যায়। (জামেউ বয়ানিল ইলমি ১৭৯)

যে জিজ্ঞাসা করতে লজ্জা পায়, মূর্খতাই হয় তার ভাগ্যলিপি। সে কখনো জ্ঞানী হতে পারে না। জনৈক কবি বলেছেন,

پیر هر چه ندانی که دل پر سیدن دلیل راه تو باشد بعز و دانائی

'যা না জান তা বিজ্ঞজনের কাছে জিজ্ঞাসা করে নাও। কেননা জিজ্ঞাসা করার অপমান হবে তোমার সম্মান ও জ্ঞানের পথপ্রদর্শক।'

প্রকৃত ইলম তখনই অর্জন হবে যখন কারো কাছে জিজ্ঞাসা করতে লজ্জাবোধ করবে না। প্রয়োজনের মুহূর্তে জিজ্ঞাসা না করার একমাত্র কারণ অহংকার। সুতরাং কোনো কিছু বুঝে না এলে সময় সুযোগে বুঝে নেবে। অন্যথায় আজ একটা বিষয় বুঝে এলো না তো কাল বোঝা গেলো না অন্যটা। এভাবে মূর্খতা বাড়তে থাকবে। ধীরে ধীরে ইলম থেকে মন উঠে যাবে। মনে হতাশা সৃষ্টি হবে। শেষ পর্যন্ত হয়ত লেখাপড়াই ছেড়ে দেবে।

অন্যের মাধ্যমেও জিজ্ঞাসা করা যায়:

হযরত আলী রা. বলেন, আমার প্রায়ই মজি বের হতো, তাই মিকদাদকে বললাম, তুমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করো। মিকদাদ জিজ্ঞাসা করলে রাসূল সা. বলেন, মজি বের হলে শুধু অজু ওয়াজিব হয়।

এই হাদীসের মাধ্যমে বোঝা গেলো, কেউ লজ্জায় উস্তাদের কাছে জিজ্ঞাসা করতে না পেরে সাথীকে অনুরোধ করলে, সাথীর উচিত জিজ্ঞাসা করা। তবে অযৌক্তিক প্রশ্ন হলে ওজর করে দেবে বা উস্তাদ যদি বলেন, যার প্রশ্ন তাকে আসতে বলো, তাহলে ভিন্ন কথা।

মজলিসের কতিপয় আদব:

> মজলিসে আলোচনা চলতে থাকলে সালাম দেবে না। আলোচনার মাঝখানে সালাম দিলে সবার মনোযোগ নষ্ট হয়। এতে কথার ধারাবাহিকতা ব্যাহত হয়, লোকে বিরক্ত হয়।

> মোতালায়ারত তালিবে ইলমের নিকট বসে থাকবে না।

> কাজের সময় সালাম ও সালামের জবাব দেওয়া ওয়াজিব নয়।

> যেখানে সালাম দিলে কারো ধ্যানচ্যুতি হয় সেখানে সালাম দেবে না।

> কর্মব্যস্ত মানুষের কাছে বসে তার ব্যস্ততা দেখবে না। এতে তার অস্বস্তি বোধ হয়, মনে বাড়তি চাপ পড়ে।
> জায়গা থাকলে কারো দিকে পিঠ দিয়ে বসবে না। জায়গার সংকুলান না হলে ভিন্ন কথা। মুসলমানের সম্মান এত অধিক যে, ইমামতির প্রয়োজন ছাড়া তাদের দিকে পিঠ দেওয়া উচিত নয়। এমনকি নামাযের পর জিকিরের সময়ও না, খানায়ে কাবার দিকে পিঠ দিতে হলেও না।

> কারো কাছে এতটা লেগে বসবে না যে, তার অস্বস্তি হয়। আবার এতটা দূরেও বসবে না যে, কথাবার্তা শুনতে কষ্ট হয়।

কাউকে তার জায়গা থেকে উঠিয়ে বসবে না।

মজলিসে কারো দিকে পা ছড়াবে না।

কেউ নিজের জায়গা ছেড়ে আবার দ্রুত সেখানে এসে বসতে চাইলে সে জায়গা তারই প্রাপ্য। অন্য কেউ সেখানে বসবে না।

কোনো কারণবশত মজলিস থেকে উঠে পুনরায় সেখানে বসার ইচ্ছে থাকলে রুমাল বা অন্য কিছু রেখে যাবে, যাতে উপস্থিত লোকেরা বুঝতে পারে।

> মজলিসে দু'জন লোক একান্তে বসলে অনুমতি ব্যতীত তাদের মাঝখানে বসবে না।

মজলিসে যেখানে জায়গা পাবে বসে যাবে। সকলের ঘাড় টপকে সামনে যাওয়ার চেষ্টা করবে না।

মজলিসে ভ্রূ কুঞ্চিত করে বসবে না। হাই যথাসম্ভব রোধ করবে। এসে গেলে চেহারা কাপড় দিয়ে ঢেকে রাখবে।

সাথীসঙ্গীর দিকে খেয়াল রাখা:

এ ব্যাপারে পবিত্র কুরআনে আল্লাহ পাক বলেন,

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجْلِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ

'হে মোমেনগণ! যখন তোমাদেরকে বলা হয় মজলিস প্রশস্ত কর, তোমরা প্রশস্ত করবে। তাহলে আল্লাহও তোমাদের জন্য প্রশস্ত করে দেবেন। (সুরা মুজাদালা ১১) এই আয়াত দ্বারা বোঝা যায়, যথাসম্ভব সাথীদের বসার জায়গা করে দেওয়া উচিত। আবার অভ্যাগতদেরও দেখা উচিত, মজলিসে জায়গা আছে কি না। সুযোগ হলে জায়গা পেলে বসবে; অন্যথায় তাদের পেরেশান করবে না।

অভ্যাগতদের ব্যাপারে কী করণীয়?

হযরত ওয়াসেলা ইবনে খেতাব রা. থেকে বর্ণিত, এক লোক রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খেদমাতে উপস্থিত হলো। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে দেখে কিছুটা সরে জায়গা করে দিলেন। ওয়াসেলা আরজ করল, হে

আল্লাহর রাসূল! জায়গা তো আছে, সরে দাঁড়াবার কী প্রয়োজন? জবাবে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, এক মুসলমানের ওপর অন্য মুসলমানের হক হলো তাকে দেখে কিছুটা নড়বে বা সরে দাঁড়াবে। (বায়হাকী)

এতে বোঝা গেলো, সাথীর পূর্ণ অধিকার হলো সে আসতেই তাকে জায়গা করে দেওয়া। অনেকে এ ব্যাপারে অভদ্রতা করে।

অজুর সঙ্গে সবকে বসা:

সবকে যথাসম্ভব অজুর সঙ্গে বসবে। বিশেষত তাফসীর, হাদীস ও কেরাতের সবকে বাঅজু থাকবে, সালাফে সালেহীন যেমন থাকতেন।

ইলমে দ্বীনের আদব-সম্মান প্রসঙ্গ১. ইমাম বুখারী রহ. হাদীস লেখার পূর্বে গোসল করতেন, পরে দু'রাকাত নফল পড়তেন। এরপর হাদীসের সত্যাসত্য সম্বন্ধে ইস্তেখারা করে হাদীসটি সহীহ বুখারীতে অন্তর্ভুক্ত করতেন। এর বরকতে আজ সারা পৃথিবীর মাদরাসাগুলোতে বুখারী শরীফ পাঠ্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত।

২. আল্লামা জাযরী রহ. নিজের শায়েখ থেকে বর্ণনা করেন, ইমাম শাতেবী রহ. ফজর নামায খুব ভোরে আদায় করে পড়াতে বসতেন। শুধু এতটুকু বলে দরস শুরু করতেন-যে প্রথম এসেছো, সে পড়। এরপর ছাত্ররা পালাক্রমে পড়তে থাকত। একদিন অভ্যাসের বিপরীত বলে ওঠেন, যে দ্বিতীয়বারে এসেছো, সে পড়। দ্বিতীয়জন পড়তে শুরু করল। প্রথমজন রয়ে গেলো। কেউ বুঝতে পারলো না প্রথমজনের কী অপরাধ। কিন্তু তার নিজের মনে পড়েছে রাতে স্বপ্নদোষের কথা। সবকে অংশগ্রহণের তাড়াহুড়ায় গোসল পর্যন্ত ভুলে গেছে। পরে গোসল সেরে আসতেই ইমাম শাতেবী রহ. বলেন, প্রথমজন পড়।

অজুর ফযীলত সম্পর্কে অনেক হাদীস বর্ণিত আছে। নিম্নে দু'টি হাদীস উল্লেখ করা হলো-

১. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন,

.أَلَا أَدُلُّكُمْ عَلَى مَا يُكَفِّرُ اللَّهُ بِهِ الْخَطَايَا وَيَزِيدُ بِهِ فِي الْحَسَنَاتِ .قَالُوا بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ
قَالَ إِسْبَاغُ الْوُضُوءِ عَلَى الْمَكَارِهِ وَكَثْرَةُ الْخُطَا إِلَى الْمَسَاجِدِ وَانْتِظَارُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ

'আমি কি তোমাদেরকে এমন বিষয়ের কথা বলে দেব না যার কারণে আল্লাহ তাআলা গোনাহসমূহ মিটিয়ে দেন এবং দরজা বুলন্দ করে দেন। সেটি হলো মনে না চাইলেও ভালোভাবে অজু করা, বেশি বেশি মসজিদে যাওয়া এবং এক নামাযের পর অন্য নামাযের জন্য অপেক্ষা করা। (ইবনে মাজা ১৬১)

২. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন,

مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ ثُمَّ رَفَعَ نَظَرَهُ إِلَى السَّمَاءِ فَقَالَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ
وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ فُتِحَتْ لَهُ ثَمَانِيَةُ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ يَدْخُلُ
.مِنْ أَيِّهَا شَاءَ

'যে ব্যক্তি ভালোভাবে অজু করে আসমানের দিকে তাকিয়ে এই দোয়া পড়বে-

.أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

জান্নাতের আটটি দরজা তার জন্য খোলা থাকবে। সে যে দরজা দিয়ে ইচ্ছে প্রবেশ করতে পারবে। (আবু দাউদ)

৩. সাহেবে মাসাবীহ রহ. সারা জীবন তা'লীফ-তাসনীফ, হাদীস ও ফেকাহের দরসে মশগুল ছিলেন। সর্বদা বাঅজু দরস দিতেন। যুহুদ ও অল্পতুষ্টিতে জীবন কাটিয়েছেন।

৪. শামসুল আইম্মা হালওয়ানী রহ. বলেন, আমরা যতটুকু ইলম পেয়েছি ইলমের তা'জীমের বদৌলতে পেয়েছি। আমি কখনো কোনো কিতাব বিনা অজুতে স্পর্শ করিনি। (তালীমুল মুতাআল্লিম।)

৫. শামসুল আইম্মা সারাখসী রহ. বায়ুরোগে আক্রান্ত ছিলেন। তবুও বিনা অজুতে কোনো কিতাব স্পর্শ করতেন না। এক রাতের মোতালায়ায় তাকে সতেরবার পর্যন্ত অজু করতে হয়েছে। (তালীমুল মুতাআল্লিম)

বিনা অজুতে কিতাবাদি স্পর্শ না করার যুক্তিসঙ্গত কারণও আছে। ইলম আসলে একটা নূর। অজুও নূর। সুতরাং ইলমের নূর অজুর নূরের কারণে বেড়ে যাওয়া স্বাভাবিক।

৬. মাওলানা আনওয়ার শাহ কাশ্মিরীর মালফুজাতে আছে, তিনি বলেন, আমার হুঁশজ্ঞান হওয়ার পর থেকে আজ পর্যন্ত কোনো কিতাব বিনা অজুতে মোতালায়া করিনি। (আকাবিরে দেওবন্দ কিয়া থে ৯৯)

৭. ইমাম মালেক রহ. ইলমে দ্বীনের খুব তা'জীম করতেন। যখন হাদীস বর্ণনা করতে চাইতেন, প্রথমে অজু করতেন, খুশবু লাগাতেন, দাড়ি আঁচড়াতেন, পরে অত্যন্ত ভাবগাম্ভীর্যের সঙ্গে দরসের উঁচু স্থানে বসে হাদীস বর্ণনা করতেন। লোকেরা এত গুরুত্বারোপের কারণ জিজ্ঞাসা করলে বলতেন, আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদীসের সম্মান করি।

৮. সহীহ বুখারীতে হযরত আবু ওয়াজেহ রহ. থেকে বর্ণিত, হযরত আবু হুরায়রা রা. বলেন, একদিন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে মদিনার এক রাস্তায় দেখতে পেলাম। আমি নাপাক ছিলাম বিধায় লুকিয়ে গেলাম। পরে গোসল সেরে তার খেদমতে উপস্থিত হলে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, আবু হুরায়রা! তুমি কোথায় ছিলে? আরজ করলাম, আমার গোসলের প্রয়োজন ছিল, বিনা গোসলে আপনার কাছে আসতে সংকোচ হচ্ছিল, তাই আসিনি।

৯. সুলতান মাহমুদের অন্তরে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মহব্বত ছিল খুবই প্রবল। মুখে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নাম নিতে পর্যন্ত অপরিসীম ভক্তি দেখাতেন। তার এক সভাসদের নাম ছিল মুহাম্মাদ। তিনি তাকে সে নামেই ডাকতেন। একদিন তাজুদ্দীন নামে ডাকলেন। ফলে তিনি মনঃক্ষুণ্ণ হয়ে শাহী হুকুম পালন করে বাড়ি চলে গেলেন। পরে তিনদিন পর্যন্ত তার কোনো হদিস নেই।

সুলতান মাহমুদ তাকে ডেকে পাঠালেন। অনুপস্থিতির কারণ জিজ্ঞাসা করলে তিনি আরজ করলেন, জাঁহাপনা! আপনি আমাকে সর্বদা মুহাম্মাদ নামে ডাকেন। সেদিন অভ্যাসের বিপরীত তাজুদ্দীন নামে ডেকেছেন। এতে মনে হলো, আমার ব্যাপারে আপনার মনে কোনো সন্দেহ জেগেছে, তাই আসিনি। বড় অস্থিরতায় কেটেছে দিনগুলো। বাদশা তাকে অভয় দিয়ে বলেন,

আসলে কোনো সন্দেহবশত আমি তোমাকে তাজুদ্দীন নামে ডাকিনি। আমার তখন অজু ছিল না। আর আমার শরম লাগে মুহাম্মাদ নাম বিনা অজুতে নিতে। আহা, কেমন সোনালী যুগ ছিল তখন! বাদশার অন্তরে পর্যন্ত রাসূলের ভালোবাসা ছিল এমন যে, তার নাম বিনা অজুতে নেয়া বেয়াদবি মনে করতেন। অথচ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নাম নেয়ার জন্য অজু শর্ত নয়। কিন্তু ভক্তি-ভালবাসা যখন চূড়ান্ত রূপ লাভ করে তখন এমন সম্ভাবনাও সামনে আসে শরীয়তে যাতে কোনো বাধা নেই।

বাঅজু থাকার বরকত:

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একবার হযরত বেলালকে জিজ্ঞাসা করেন, বেলাল! তুমি কী আমল করো যে, জান্নাতে তোমার জুতোর আওয়াজ শুনতে পেলাম? তিনি আরজ করেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমি সর্বদা বাঅজু থাকার চেষ্টা করি। আর যখনই নতুন অজু করি দু'রাকাত তাহিয়াতুল অজু পড়ে নিই।

অজুর প্রভাব:

ফকীহ আবুল লাইস সমরকন্দী নিজ পিতার সূত্রে বর্ণনা করেন, হযরত ওমর রা. একবার কাবা শরীফের গিলাফের কাপড় কেনার জন্য একজনকে মিশরে পাঠালেন। তিনি সিরিয়া হয়ে যাওয়ার পথে একটা গির্জা দেখে পাদ্রীর সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য গেলেন। দরজায় দীর্ঘক্ষণ কড়া নাড়ার পর পাদ্রী দরজা খুলেন। পর বিলম্বে দরজা খোলার কারণ জিজ্ঞাসা করলে পাদ্রী বলেন, তোমাকে দূর থেকে আসতে দেখে আমাদের মাঝে এমন ভীতির সঞ্চার হলো যে, মনে হচ্ছিল কোনো জালেম বাদশা

বুঝি আসছেন! তাই অজু করে নামায পড়ে পরে দরজা খুললাম। আল্লাহ তাআলা হযরত মূসা আ. কে বলেছেন, 'যদি কোনো জালেম বাদশার ভয় হয় নিজে অজু করবে এবং পরিবারের সবাইকে অজু করাবে। কেননা বাঅজু ব্যক্তি আমার হেফাজতে থাকে।'

শায়খুল হাদীস যাকারিয়া রহ.-এর অজুর প্রতিজ্ঞা:

শায়খুল হাদীস যাকারিয়া রহ. বলেন, মুহাম্মাদ হাসান নামে আমার এক সাথী ছিল। তার মতো আদর্শবান সাথী আমার কৈশোরে যৌবনে আর পাইনি। আমরা দু'জন প্রতিজ্ঞা করেছিলাম, বিনা অজুতে কোনো সবক পড়বো না। আবার কোনো হাদীস ছুটে যেতেও দেব না। আমরা দু'জন দরসে জমজ ভাইয়ের মত বসতাম। তার অজুর প্রয়োজন হলে কনুই দিয়ে গুঁতো মেরে উঠে যেতো, অমনি আমি বলে উঠতাম- হযরত! এখানে একটা প্রশ্ন আছে। যাতে সবক আগে না বাড়ে, সে অজু করে আসতে পারে। এভাবে আমি গেলেও সে প্রশ্ন করতো। একবার আমি প্রশ্ন করলাম, হযরত! ফাতহুল কাদীরে তো এমন লেখা হয়েছে। আব্বাজান বলেন, প্রথমে একটা কিচ্ছা শোন। তোমার ফাতহুল কাদীরের কথা পরে শুনবো। আব্বাজান সবকে মাঝেমধ্যে কিচ্ছা বা কবিতা শোনাতেন, তবে গাম্ভীর্য ধরে রাখতেন। আমিও সবকে শশমাহী পর্যন্ত আব্বাজানের অনুসরণ করি। পরে হযরত খলিল আহমদ সাহরানপুরীর অনুসরণ করি। কেননা কিতাব শেষ করতে হবে। (আপবিতী।)

■ সাফল্য লাভের উপায় ও শর্তাবলী প্রসঙ্গ:

সুদৃঢ় ইচ্ছা শক্তি:

মানুষ পৃথিবীতে আল্লাহ তাআলার প্রতিনিধি। আল্লাহ তাআলা মানুষকে সৃষ্টি করে বহু গুণে গুণান্বিত করেছেন। জ্ঞান-বুদ্ধি, চিন্তাশক্তি ও বাকশক্তি দিয়েছেন। আরো বহু নেয়ামত দান করেছেন, মানুষ হাজারো চেষ্টা করে যা অর্জন করতে পারবে না। তেমনি এক মহা নেয়ামত হলো মানুষের ইচ্ছেশক্তি। অনেক আপাত-অসম্ভব-কাজও সম্ভব হয়ে যায় মানুষের প্রচণ্ড ইচ্ছেশক্তির ফলে। এ নেয়ামত ঈমানদারদের মাঝে বেশি পাওয়া যায়। কোনো কোনো কাফেরের মাঝেও পাওয়া যায় এ গুণবৈশিষ্ট্য। তাই তো দেখা যায়, তাদের কেউ কেউ অসাধ্য সাধন করে ফেলেন।
আমি পারব, নিজের ব্যাপারে এমন হিম্মত রাখতে হবে। আমি পারব না, কোনোভাবেই এমন হীনম্মন্যতার শিকার হওয়া যাবে না।

হীনম্মন্যতাবোধ পরিহার করুন:

যৌবনের শুরুতে একটা শের পড়েছিলাম। পড়ে প্রচণ্ড আলোড়িত হয়েছিলাম। নতুন চেতনায় হয়েছিলাম উজ্জীবিত। দার্শনিক কবি আল্লামা ইকবাল নতুন চাঁদকে লক্ষ্য করে বলেছেন

در خود نظر کشاز تہی دامن مرنج +در سینہ تو ما ہے تمامے نہادہ اند

'শূন্য আঁচল দেখে তুমি ক্ষুণ্ণ কেনো হও। সিনায় তোমার পূর্ণিমার চাঁদ দেখতে নাহি পাও।'
প্রথমার ক্ষীণ চাঁদ। বাঁকা চিকন। নিষ্প্রভ তার আলো। এমনি চাঁদকে লক্ষ্য করে আল্লামা ইকবাল বলেন, হে চাঁদ, তোমার ক্ষীণ চিকন দেহ দেখে হতাশ হয়ো না। দুঃখ-বেদনায় ভেঙ্গে পড়ো না। তুমি কি ভাবছো, আমি এতো সরু, এতো চিকন; অল্পস্থায়ী আমার জীবন। দেওয়ার মতো আমার কী আছে? কিছুই নেই-না আলো, না সৌন্দর্য। পৃথিবীবাসীকে আমি কী দেবো? একটা কিছু যদি দিতে নাই পারি আমার

বেঁচে থাকার সার্থকতা কোথায়? কী নিয়ে আমি পৃথিবীর আকাশে আত্মপ্রকাশ করবো? বিশাল আকাশে নিষ্প্রভ নিষ্প্রাণ ঘুরে বেড়াবো? এযে চরম লজ্জার! লোকে তো আমার প্রয়োজনই অস্বীকার করবে। সম্পূর্ণ অপাঙ্ক্তেয় বলে উপেক্ষা করবে। আকাশের গায়ে কলঙ্কের তিলক হয়ে আমি বিরাজ করব। আমাকে ছাড়াও আকাশ সুন্দর থাকবে। নক্ষত্রের আলোয় ঝলমল করবে। এসব ভাবনায় চাঁদ যখন অস্থির বিপর্যস্ত। আল্লামা ইকবাল নতুন চাঁদকে সান্ত্বনা দিয়ে বলেন-হতাশ হয়ো না চাঁদ! দেওয়ার মতো তোমার আছে অনেক কিছু। আজ হয়ত তুমি ক্ষীণ নিষ্প্রভ। তোমার আলোতে তুমি নিজেই আলোকিত নও। কিন্তু যাক না ক'টা দিন; আসুক না পূর্ণিমা। দেখবে, তোমার আলোতে জগৎ উদ্ভাসিত হবে। পৃথিবীর আটকাই হেসে উঠবে তোমার দ্বিগ হোমনায়। আর পাহানীবাসী STSEনা পূর্ণিমা। দেখবে, তোমার আলোতে জগৎ উদ্ভাসিত হবে। পৃথিবীর আকাশ হেসে উঠবে তোমার স্নিগ্ধ জোসনায়। আর পৃথিবীবাসী, মুগ্ধ-বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকবে তোমার সৌন্দর্যপানে। তোমার জোসনায় অবগাহন করে দেহে-মনে স্নিগ্ধ হবে। উজ্জ্বল তুমি আকাশের গায়ে ভেসে বেড়াবে সগৌরবে। তোমাকে দেখে নক্ষত্রেরা সব পালিয়ে যাবে। তোমার ঔজ্জ্বল্যের সামনে ম্লান হয়ে যাবে নক্ষত্রের আলো। একটু সবর করো চাঁদ! একটু সবর করো!

আমাদের তালিবে ইলমদের অবস্থা অবিকল নতুন চাঁদের মতো। ওরাও নিজেদের নিয়ে বিব্রত। আধুনিক শিক্ষা, সভ্যতা ও সংস্কৃতির সামনে ভীত সন্ত্রস্ত। প্রযুক্তির ধাঁধায় ধাঁধিয়ে গেছে ওদের চোখ। বিজ্ঞান-প্রযুক্তি ও নিত্য-নতুন আবিষ্কারে ওরা সদা কম্পমান। বিভিন্ন বাদ-মতবাদ ও চিন্তা-দর্শনের সামনে জবুথবু। বুকে বল নেই, মুখে ভাষা নেই; নিজেদের শিক্ষা-সভ্যতা ও চিন্তা-দর্শনের প্রতি আস্থা নেই। নেই নিজস্ব সভ্যতা-সংস্কৃতির ব্যাপারে সুষ্ঠু ধারণা। সর্বদা পলায়নপর মনোভাব। কারো মুখোমুখি হওয়ার সাহস নেই। সে যেনো ভাসমান খড়কুটো, যেদিকে স্রোত বয় সেদিকে বয়ে যায়। অথবা শুকনো ঝরা-পাতা, বাতাসের গতিই তার গতি। নিজের শক্ত-মজবুত অবস্থান নেই। কোথাও হাঁটু গেঁড়ে বসতে পারে না; কোমর সোজা করে দাঁড়াতে পারে না।

কুরআন-পড়ুয়া তালিবে ইলমরা এতো দুর্বল কেনো? এমন হীনম্মন্যতা-বোধে আচ্ছন্ন কেনো? ওরা কি জানে না নিজেদের পরিচয়? কে সে? কী তার পরিচয়? রাতদিন সে

কী পড়ে? কোন্ সভ্যতা-সংস্কৃতির ধারক সে? পৃথিবীবাসীকে সে কী দিতে চায়? পরিচয়-বিস্মৃতি আসলে আমাদেরকে দুর্বল করে রেখেছে। হীনবল করে রেখেছে।

আমার প্রিয় তালিবে ইলম! তুমি বিশ্বাস করো, সাড়ে আটশো কোটি মানুষের এই পৃথিবীতে তুমি দুর্বল নও। অযোগ্য ও অপদার্থ নও। পৃথিবীকে তোমার দেওয়ার আছে অনেক কিছু। পৃথিবীও তা পাওয়ার জন্যে ব্যাকল। পৃথিবীকে তুমি যা দিতে পারো-বিশ্বাস করো-আধুনিক বিজ্ঞান-প্রযুক্তি তা দিতে অক্ষম। পৃথিবীকে তুমি দিতে পারো বিশ্বাসের হিরন্ময় জ্যোতি। নীতি ও আদর্শের চির উন্নত পথ। পৃথিবীবাসীর সামনে তুমি তুলে ধরতে পারো দুনিয়া ও আখেরাতের প্রকৃত পরিচয়। তাদের দেখাতে পারো জান্নাতের পথ।

তুমি আরো দিতে পারো একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা; শাশ্বত ও কল্যাণকর রাষ্ট্রব্যবস্থা। তুমি যা জান তা অকাট্ট। তাতে বিন্দু-বিসর্গ সন্দেহ নেই। বিজ্ঞান একেক যুগে একেক কথা বলে। বিজ্ঞানে চিরন্তন বলে কিছু নেই। আজ যে আবিষ্কারে পৃথিবী তোলপাড় কিছুকাল পর হয়ত তা ভ্রান্ত বলে প্রতিপন্ন হবে। আঁস্তাকুড়ে নিক্ষিপ্ত হবে। অথচ তোমার আকীদা-বিশ্বাস, তোমার চিন্তা-দর্শন শাশ্বত, চিরন্তন। কখনো তা পরিবর্তন হবার নয়। বিজ্ঞান যতোই উন্নতি করুক তোমার বিশ্বাসে সামান্য চিড় ধরাতে পারবে না। এ তো আর বিকৃত খৃস্টধর্ম নয়; বিজ্ঞানের সঙ্গে যাকে ম্যানেজ করে চলতে হয়। নয় নীতিসর্বস্ব বৌদ্ধধর্ম; জীবন-সমস্যার সমাধান যেখানে পাওয়া যায় না। আবার হিন্দুদের মতো অলীক বিশ্বাসের ধর্মও নয়; বিজ্ঞানের চরম উৎকর্ষের যুগে যা সম্পূর্ণ অচল। যুগে যুগে কতো আবিষ্কার ইসলামের গায়ে কালিমা লেপন করতে চেয়েছে। কিছু মূর্খ পণ্ডিত তাতে বিচলিত হয়ে বিজ্ঞানের কাছে আত্মসমর্পণ করে ম্যানেজ করতে চেয়েছেন। কিন্তু উলামায়ে কেরাম গর্জে উঠেছেন। যক্ষের ধনের ন্যায় আগলে রেখেছেন নিজেদের আকীদা-বিশ্বাস। আজ কোথায় সেই পণ্ডিতেরা? আর কোথায় সেই আবিষ্কার? সেসব আজ অতীতের বিষয়। ইতিহাসের ভাগাড়ে পরিণত হয়েছে। কিন্তু তোমার জ্ঞান, তোমার শিক্ষা-সভ্যতা শাশ্বত, চিরন্তন।

একটা কথা আবারো বলি, সাড়ে আটশো কোটি মানুষের এই পৃথিবীতে তুমি দুর্বল নও; হীন ও নীচু নও। সমাজের চোখে ছানি, তাই দেখতে পায় না তোমার ঔজ্জ্বল্য।

ওদের মস্তিষ্কে বিকৃতি, তাই অনুধাবন করতে পারে না তোমার মর্যাদা। ওরা অন্ধ বলে তুমি কি করুণা করবে না? ওরা মূর্খ বলে তুমি কি সদয় হবে না? না ইলম-কালাম ছেড়ে দেবে?

আচ্ছা, তুমিই বলো, অমুসলিম দেশে লাখো লাখো বৌদ্ধভিক্ষু সমাজকে কী দেয়? শত শত গির্জার হাজার হাজার পাদ্রী, হাজার হাজার মন্দিরের লাখো লাখো পুরোহিতের চেয়ে তোমার অবদান কম কিসে? ওরা তো ওদের দেশে দিব্যি বেঁচে-বর্তে আছে। সম্মান নিয়ে, প্রভাব-প্রতিপত্তি নিয়ে বেঁচে আছে। পৃথিবীতে তারা যদি বেঁচে থাকার অধিকার পায়, সম্মান ও প্রভাব-প্রতিপত্তি পায়, তুমি কেনো পাবে না? তাদের কাছে তো সমাজ-সভ্যতাকে আশ্বস্ত করার মতো কিছু নেই। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিকে চ্যালেঞ্জ করার মতো কিছু নেই। কিছু আপ্তবাক্যই তাদের পুঁজি। এসব অবলম্বন করেই তারা দিব্যি বেঁচে আছে। বরং প্রচণ্ডভাবে বেঁচে আছে। কই, বৌদ্ধভিক্ষুরা সমাজের বোঝা, তাদের দেশ থেকে তাড়িয়ে দাও, গির্জা-মন্দির বন্ধ করে দাও, এমন শ্লোগান তো শোনা যায় না। পাদ্রী-পুরোহিতরা সমাজের অযাচিত ভার, এমন কথা তো ওদের বলতে শুনিনি। কিছু অন্ধ ও বিকৃত-মস্তিষ্ক লোকের কথায় ঘাবড়ে যাবে? সবকিছু ছেড়েছুঁড়ে পালিয়ে যাবে? না ভাই না, এভাবে পালিয়ে যাওয়া তো কাপুরুষের লক্ষণ। রুখে দাঁড়াও! জ্ঞান দিয়ে, গুণ দিয়ে, যোগ্যতা ও প্রতিভা দিয়ে ওদের সমুচিত জবাব দাও। তোমার জ্ঞান-প্রভার সামনে ওদের ঔজ্জ্বল্য যেনো ম্লান হয়ে যায়। তোমার বিশাল বিপুল যোগ্যতার সামনে ওরা যেনো অকিঞ্চিৎকর প্রমাণিত হয়, তেমন যোগ্যতা তুমি অর্জন করো। তারপর দেখো, সময় তোমার কদর করে কি না? সমাজ তোমাকে সম্মান করে কি না? আজকাল কেউ কাউকে সম্মান করতে চায় না। সম্মান একপ্রকার আদায় করে নিতে হয়। জ্ঞান দিয়ে, গুণ দিয়ে, যোগ্যতা ও প্রতিভা দিয়ে সমাজকে বশীভূত করতে হয়। তখন গিয়ে সমাজ মাথা তুলে তাকায়। সময় ও সমাজ একমাত্র জ্ঞানের সামনেই মাথা নত করে।

ইচ্ছেশক্তি বৃদ্ধির উপায়:

শায়েখগণ বলেন, অধিক পরিমাণে জিকির ও আল্লাহওয়ালাদের সোহবতে মানুষের হিম্মত ও মনোবল বৃদ্ধি পায়। তরমুজ যেমন তরমুজ থেকে রং গ্রহণ করে। সাধারণ

মানুষও আল্লাহওয়ালাদের সোহবতে অসাধারণ হয়ে হয়ে ওঠে। তাদের জীবনের গতিধারা পাল্টে যায়। মুমিনের ইস্তেকামত ও দৃঢ়তা কেমন হওয়া উচিত তার নমুনা পাওয়া যায় সাহাবায়ে কেরামের জীবনে।

■ জেহেন ও স্মরণ শক্তি প্রসঙ্গ:

জ্ঞান ও বুঝশক্তি বৃদ্ধি করার উপায়:

হযরত থানভী রহ. বলেন, নিম্নলিখিত পদ্ধতি অবলম্বন করলে অবশ্যই বুঝশক্তি পাকা হবে এবং দ্বীনী জ্ঞান বৃদ্ধি পাবে ইনশাআল্লাহ!

১. লোকজনের সঙ্গে বেশি মেলামেশা না করে অধিকাংশ সময় নির্জনতা অবলম্বন করা।

২. চোখের হেফাজত করা। অর্থাৎ প্রয়োজন ব্যতীত এদিক সেদিক দৃষ্টি না দেওয়া।

৩. গোনাহ থেকে বেঁচে থাকা। যারা এ তিনটি বিষয়ের উপর আমল করবে, তাদের মেধা-প্রতিভা ও বুঝশক্তির মধ্যে নূরানিয়ত পয়দা হবে ইনশআল্লাহ। এটা আমার জীবনের বাস্তব অভিজ্ঞতা।

হাকীমুল উম্মত থানবী রহ. আরো বলেন, বিশ্বাস না হলে আপনারা এমন দু'জন আলেমের কাছে যান যাদের একজন পরহেযগার এবং অন্যজন শুধুমাত্র আলেম, পরহেযগার নন। আমি কসম করে বলতে পারি, পরহেযগার আলেমকে অবশ্যই আপনারা অধিক সমঝদার ও বুদ্ধিমান পাবেন। আর নিছক আলেম লোকটিকে পাবেন খিটখিটে মেজায ও মূর্খ প্রকৃতির। এমনকি আলেম না হোক শুধু পরহেযগার হলেও তাকে বেআমল আলেমের তুলনায় অধিক বুদ্ধিমান পাবেন।

স্মরণশক্তি দুর্বল হলেও কৃতিত্ব রাখা যায়:

পৃথিবীতে যত মনীষী অতিবাহিত হয়েছেন তাদের অল্পসংখ্যক এমন ছিলেন যাদের ছিল জন্মগত প্রতিভা। অসাধারণ স্মৃতিশক্তি নিয়ে তারা পৃথিবীতে আগমন করেছেন। তাছাড়া অধিকাংশের অবস্থা হলো, প্রতিভা তাদের স্বোপার্জিত। স্মরণশক্তি তারা বাড়িয়ে নিয়েছেন অতুলনীয় নিষ্ঠা ও নিরলস সাধনা দ্বারা। কম সংখ্যক মানুষই জন্মগত প্রতিভা নিয়ে জন্মায়। তাদের অধিকাংশ হয় আবার প্রচণ্ড খামখেয়ালে। ছন্নছাড়া ও ভবঘুরে প্রকৃতির। কোনো কিছুতে মনোযোগ দিতে পারে না; জীবনে ধীরতা নেই, স্থিরতা নেই, সদা চঞ্চল ও অস্থিরচিত্ত। ফলে তাদের প্রতিভার ঘটে নির্মম অপচয়। অনেক প্রতিভা আবার অঙ্কুরেই বিনষ্ট হয়েধীরতা নেই, স্থিরতা নেই, সদা চঞ্চল ও অস্থিরচিত্ত। ফলে তাদের প্রতিভার ঘটে নির্মম অপচয়। অনেক প্রতিভা আবার অঙ্কুরেই বিনষ্ট হয়ে যায়। বিপথে কুপথে চলে যায়। যারা অত্যধিক চেষ্টা-সাধনার মাধ্যমে সুপ্ত প্রতিভার বিকাশ ঘটায় তারা সহজে বিপথগামী হয় না। লক্ষ্যের পানে তারা থাকে অটল অবিচল। কোনো লোভ-প্রলোভন তাদেরকে লক্ষ্যচ্যুত করতে পারে না। পৃথিবীতে যারা বিরাট কর্ম ও অমর কীর্তি রেখে গেছেন, নিজেদের দান-অবদান দ্বারা পৃথিবীবাসীকে করেছেন চিরঋণী, তাদের অনেকের জীবনেতিহাস থেকে জানা যায়, শৈশব কৈশোরে তাদের স্মৃতিশক্তি তেমন ভালো ছিল না। বিশ্ববিখ্যাত আরবী সাহিত্যিক সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদবী প্রথম জীবনে আরবী সাহিত্যের সাধারণ কিতাব 'নাফহাতুল আরবে' ফেল করেছেন। অথচ তারই হাতে লেখা হয়েছে مَا ذَا خَسِرَ الْعَالَمُ এর মতো বিশ্ব বিখ্যাত কিতাব।স্মরণ রাখার উপায়

স্মরণ রাখার অনেকগুলো উপায় রয়েছে। যথা-

এক. স্মরণ রাখার জন্য প্রথমে প্রয়োজন নিজের ওপর পূর্ণ আস্থা ও আত্মবিশ্বাসের। নিজের মানসিক ও দৈহিক শক্তি একটু তলিয়ে দেখলে এই আস্থা ও আত্মবিশ্বাস বহুগুণ বেড়ে যাবে। নিজের দেহের দিকে একটু তাকাও, পাঁচ শতাধিক মাংশপেশী, দুই শতাধিক হাড় ও পঞ্চাশ ট্রিলিয়ন দেহকোষ মিলে গঠিত তোমার দেহ। তাছাড়া শরীরের প্রতি কোষে খাবার পৌঁছানোর জন্য রয়েছে ষাট মাইল দীর্ঘ পাইপ লাইন। প্রত্যেকের হার্ট প্রতিদিন কমপক্ষে এক লক্ষ বার স্পন্দন করে। এভাবে রক্ত

সঞ্চালনের মাধ্যমে দেহ সচল রাখে। এছাড়া মানুষের যে ব্রেন তা যে কোনো অত্যাধুনিক কম্পিউটারের চেয়ে কমপক্ষে দশ লক্ষগুণ বেশি শক্তিশালী। এত কিছুর মালিক যে মানুষ, সে কেন হতাশ হবে? সে কেন সামান্য পড়া মনে রাখতে পারবে না? প্রচণ্ড আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে মনোযোগী হলে সবই মনে থাকবে।

দুই. স্মরণ রাখার আরেকটি উপায় হলো সুশৃঙ্খলভাবে পড়াশোনা করা। মনে না থাকার অন্যতম কারণ বিশৃঙ্খল পড়াশোনা। মনে থাকা মানে মনে গেঁথে রাখা, থরে থরে সাজিয়ে রাখা। এলোমেলো পড়াশোনা,অস্থিরচিত্তে পড়াশোনা মনে গাঁথে না। সুশৃঙ্খলভাবে সাজানো থাকে না। কিছুক্ষণ পরেই ভুলে যায়। প্রয়োজন মুহূর্তে মনে আসে না। কিছু পড়ে জাবর কাটার মত আবৃত্তি করতে হয়, মনে মনে রিহার্সেল দিতে হয়, তাহলে সহজে মনে গেঁথে যায়।

তিন. স্মরণ রাখার জন্য রুচিবোধের প্রভাব অনস্বীকার্য। রুচির সঙ্গে স্মরণশক্তির রয়েছে চমৎকার সাজুয্য। যার যে বিষয়ে আগ্রহ সে বিষয় তার মনে থাকে ভালো। হযরত থানবী রহ. আশপাশের লোকদের নাম প্রায়ই ভুলে যেতেন, বারবার জিজ্ঞাসা করতেন। একজন প্রশ্ন করল, হযরত! আপনার ব্রেন তো খারাপ না; যখন বলতে শুরু করেন কতহযরত! আপনার ব্রেন তো খারাপ না; যখন বলতে শুরু করেন কত আয়াত, হাদীস, ঘটনা অনর্গল বলে যান। লিখতে শুরু করলে যেন ইলমের বান ছোটে। কিন্তু মানুষের নাম মনে রাখতে পারেন না কেন? জবাবে হযরত থানবী বলেন, তুমি ঠিকই বলেছো, আমি নাম মনে রাখতে পারি না। কারণ নামের সঙ্গে আমার জেহনী মুনাসাবাত কম। সত্যিই স্মরণশক্তির ওপর রুচিপ্রবণতার প্রভাব বিরাট।

লেখাপড়া আর খাদ্য গ্রহণের মাঝে রয়েছে চমৎকার মিল। উভয়টা হজম করতে হয়। উভয়টার জন্য খিদে প্রয়োজন। খিদে পেলে যেমন খেতে হয় তেমনি কৌতূহল নিয়ে পড়তে হয়। বেশি খেলে যেমন বদহজম হয়, তেমনি জোর করে পড়লেও বিশেষ ফায়দা হয় না। মনের খিদে হলো আগ্রহ ও কৌতূহল, জানার প্রচণ্ড ইচ্ছে। যার ইচ্ছে যত প্রবল তার খিদেও তত বেশি। যার খিদে বেশি তার মনোযোগও বেশি। নিবিড় মনোযোগই মনে রাখার প্রধান উপায়।

চার, স্মরণ রাখার জন্য বুঝে পড়ার বিকল্প নেই। না বুঝে মুখস্থ করলে দু'দিনেই ভুলে যাবে। এর বিশেষ কোনো ফায়দা নেই। বুঝে থাকলে মুখস্থ না হলেও ফায়দা থেকে খালি নয়। সার কথাটা অন্তত মনে থাকবে। যারা বুঝে মুখস্থ করে তাদের পড়া হয় সার্থক। না বুঝে মুখস্থ করা তোতা পাখির বুলির মত।

পাঁচ. শুধু বুঝে মুখস্থ করলেই হবে না, বিষয়টা লিখে বারবার পুনরাবৃত্তি করে আত্মস্থ করতে হবে। অনেকে বলতে পারে ঠিক, কিন্তু লিখতে পারেনা। জানা বিষয় লিখে প্রকাশ করা গেলে পূর্ণরূপে শেখা হয়। লিখতে না পারা না বুঝারই নামান্তর। সাজিয়ে গুছিয়ে লিখতে পারা বিরাট যোগ্যতার ব্যাপার। অনেকে কিতাব মুখস্থ করে ঠিক, বোঝেও বেশ ভালো, কিন্তু লিখে প্রকাশ করতে পারে না বিধায় নম্বর কম পায়। লেখার প্রতি তাদের যত্নবান হওয়া উচিত। পড়া তখনই পূর্ণরূপে আত্মস্থ হয় যখন মুখস্থের পর তা লেখা হয়। লেখার একটা বিশেষ ফায়দা হলো, এতে দীর্ঘ বিষয়কে অতি সংক্ষেপে আনা যায়। কেউ যদি পুরো কিতাব কয়েক পৃষ্ঠায় লিখতে চায় পারবে। বলার বেলায় তেমন সংক্ষেপে করা যায় না। বিশবার পড়ার চেয়ে একবার লেখার গুরুত্ব বেশি।

ছয়. পড়া মুখস্থ রাখার সবচেয়ে কার্যকর উপায় হলো মুযাকারা ও তাকরার। মুযাকারা করলে বিষয়টা আত্মস্থ হয়, ভুলত্রুটি দূর হয় এবং সুন্দরভাবে উপস্থাপনার যোগ্যতা হয়। কোথাও অস্পষ্টতা থাকলে ধরা পড়ে। অনেক সময় মনে হয় বুঝেছে, আসলে বোঝেনি, বলতে গেলে আটকে যায়, কাউকে শোনাতে পারে না। শোনাতে না পারা মূলত না বোঝার প্রমাণ। যে স্পষ্ট বোঝে তার তো শোনাতে পারার কথা। মুযাকারার জন্য কাউকে না পেলে নিজেই মনে মনে আওড়াবে, রিহার্সেল দেবে।

সাত. যারা প্রথম দ্বিতীয় হয় তাদের সফলতার পিছনে অন্য কোনো রহস্য নেই, নেই কোনো যাদুমন্ত্রের প্রভাব। কঠিন পরিশ্রম ও নিরবচ্ছিন্ন সাধনার বলেই তারা প্রথম হয়। ক্লাশের বোকা ছাত্রটাও যদি নিয়মিত পড়াশোনা করে তাহলে তরতর করে এগিয়ে যাবে। একসময় প্রথম সারিতে চলে যাবে। প্রথম স্থানটি কারো জন্য নির্দিষ্ট নয়। যে কেউ সাধনার বলে প্রথম হতে পারে। প্রতিভা মানেই সীমাহীন ধৈর্য ও অতুলনীয় নিষ্ঠা। ধৈর্য ও নিষ্ঠার বলে যে কেউ প্রথম হতে পারে, অসাধ্য সাধন

করতে পারে। প্রত্যেকের মাঝেই সুপ্ত রয়েছে অতুল প্রতিভা ও অসাধারণ সম্ভাবনা। সাধনার মাধ্যমে সে প্রতিভা জাগিয়ে তুলতে হয়। পরিশ্রমের মাধ্যমে সে সম্ভাবনা বিকশিত করতে হয়। আজ যে খারাপ ছাত্র হিসেবে অবজ্ঞার শিকার, সে যদি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়, বজ্রমুঠে শপথ নেয়; খুব বেশি নয় কয়েক মাসেই তার অবস্থার পরিবর্তন হতে পারে। ধৈর্য ও নিষ্ঠা হলো সেই পরশপাথর, যার ছোঁয়ার মাটি সোনা হয়, মানুষের ভাগ্য পাল্টে যায়।

স্মরণশক্তি দুর্বল হওয়ার কারণ:

স্মরণশক্তি দুর্বল হওয়ার একটা বিশেষ কারণ হলো গোনাহ। গোনাহ করলে তার ক্ষতি অনিবার্য। আল্লাহ তাআলা বলেন,

مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ

'যে মন্দ কাজ করবে তাকে শাস্তি দেওয়া হবে।'

মূলনীতিটা ভালো করে উপলব্ধি করা দরকার। গোনাহ করলে এর প্রায়শ্চিত্ত ভোগ করতেই হয়, শাস্তি পেতেই হয়। ছাত্র হলে তার স্মৃতিশক্তি দুর্বল হয়ে যাবে। অনেকে অনুযোগ করে বলেন, আমার কিছুই মনে থাকে না। মোতালাআ করি কিন্তু ভুলে যাই।

ইমাম শাফেয়ী রহ. তার প্রাণপ্রিয় উস্তাদের নিকট স্মৃতিশক্তির দুর্বলতার অভিযোগ করেন। জবাবে উস্তাদ বলেন, গোনাহ ছেড়ে দাও। ইমাম শাফেয়ী রহ. বলেন,

شَكَوْتُ إِلَي وَكِيعِ سُوءَ حِفْظِيْ فَاوْصَانِي إِلَي تَرْكِ الْمَعَاصِيْ فَإِنَّ الْعِلْمَ نُوْرُ مِنْ الهِي وَنُوْرُ اللهِ لَا يُعْطِي لِعَاصِيْ

'আমি আমার প্রাণপ্রিয় উস্তাদ ইমাম ওয়াকীর নিকট স্মৃতিশক্তির দুর্বলতার অভিযোগ করলাম। তিনি আমাকে অসিয়্যত করে বলেন, বাছা, গোনাহ থেকে বেঁচে থাক।

কেননা ইলম আল্লাহপ্রদত্ত নূর আর আল্লাহপ্রদত্ত নূর কোনো গোনাহগারকে দেওয়া হয় না।'

গোনাহ থেকে বেঁচে থাকলে স্মৃতিশক্তি বৃদ্ধি পায়। অনেকে জিজ্ঞাসা করে, হযরত! মেধাশক্তি বৃদ্ধির কোনো আমল আছে কি না? বলি, সবচেয়ে বড় আমল হলো গোনাহ থেকে বেঁচে থাকা।

অর্জিত ইলম কেন ছুটে যায়?

গোনাহের কারণে অর্জিত ইলম চলে যায়। আজকাল তালিবে ইলমরা সারাদিন কুরআন-হাদীসের নূর দিলে ভরে। আসরের পর ঘুরতে যায় বাজারে মার্কেটে। সেখানে সব শেষ করে আসে। এদিক সেদিকে দৃষ্টি দেয়, বন্ধুদের সঙ্গে উল্টাসিধা হাসি-মজাক করে, এভাবে সব নূর বিসর্জন দিয়ে আসে। মশকের ছিদ্র দিয়ে যেমন পানি বেরিয়ে যায়, তেমনি গোনাহের কারণে ইলম চলে যায়। আল্লাহওয়ালা আর সাধারণ মানুষের মাঝে পার্থক্য এখানেই। আল্লাহওয়ালাগণ অর্জিত নূর ও অর্জিত ইলম ধরে রাখতে পারেন, অন্যরা তা পারে না।
তাই আমাদের সবার গোনাহ থেকে সর্বোচ্চ বেচে থাকার চেষ্টা করতে হবে।

■ পঞ্চম অধ্যায় ■

■ ইলম অন্বেষণে বিমুখিতা:

ইলমের এত মর্যাদা ও গুরুত্ব থাকা সত্ত্বেও কিছু মানুষকে আমরা দেখি, তারা ইলম থেকে একেবারে বিমুখ, গাফিল, অমনোযোগী। কেউ ব্যবসা-বাণিজ্য ও তার ভাগ-বাটোয়ারা নিয়েই মহাব্যস্ত। কেউ ব্যস্ত জীবিকা উপার্জন আর অর্থ-সম্পদ কামানোর পেছনে। এমন মানুষের সংখ্যাও কম নয়, যারা নানান খেলতামাশায় মত্ত। কেউ সময় নষ্ট করছে ভ্রমণ ও পর্যটনে।

কেউ নিজ পেশায় মশগুল তো, পরক্ষণে সে-ই আবার অবসরে আনন্দ-ভ্রমণে ব্যস্ত। এমন ব্যস্ততার মাঝেও বিভিন্ন ধরনের গণমাধ্যমগুলোও প্রতিনিয়ত কেড়ে নেয় আমাদের অনেক মূল্যবান সময়। টিভি, রেডিও, পেপার-পত্রিকা আমাদের ব্যস্ত রাখছে। খেলাধুলা, বিনোদন-বিলাসিতা এক ব্যস্ততার পর আরেক ব্যস্ততায় আমাদের মাতিয়ে তুলছে। ফলে আমাদের ব্যস্ততা ক্রমেই বেড়ে যাচ্ছে। তাই এখনকার চিত্রটা হলো ব্যস্ততার পর ব্যস্ততা। এক ব্যস্ততা সেরে উঠতে না উঠতেই আরেক ব্যস্ততা অপেক্ষায় থাকে আমাদের ব্যস্ত করার জন্য।

এমনকি এক শিক্ষক বলেছেন, 'তার কিছু ছাত্র খেলাধুলায় দিনের প্রায় বারো ঘণ্টা ব্যয় করত। একটা খেলা শেষ করতেই তাদের শুরু হতো আরেকটা খেলা।' চার মিলিয়ন কিশোর দৈনিক ছয় ঘণ্টারও অধিক সময় শুধু ইন্টারনেটে মত্ত থাকে। এতটা সময় তারা নেটে কী করে?! নিঃসন্দেহে বিভিন্ন প্রেম, গল্প, অহেতুক কল্প-কাহিনী, উত্তেজক বিভিন্ন কন্টেন্ট দেখার মাঝেই তো তারা লিপ্ত থাকে। কারও ঘণ্টার পর ঘণ্টা সময় নষ্ট হয় গেমস খেলতে খেলতে। এরপর আবার সে সকল খেলা নিয়ে চলে একে অন্যের সাথে বিতর্ক, এভাবেও তারা সময় নষ্ট করে। বিভিন্ন অহেতুক কথাবার্তা, চ্যাটিং-ম্যাসেজিং-এর মগ্নতা একটার পর একটা তাদের আবদ্ধ করে রাখে।

হরেক মডেলের গাড়ির সৌন্দর্য নিয়ে আসক্ত থাকে অনেকে। নানান ভোগ-বিলাসিতায় ডুবে তারা সময় অতিবাহিত করে। শক্তিবর্ধনে বিভিন্ন জিমে গিয়ে ব্যায়াম করে। কিন্তু শরীরের এ শক্তিবর্ধন ইবাদতের উদ্দেশ্যে নয়; বরং এ তো হয়ে থাকে ভোগ-বিলাসিতায় আরও বেশি ডুবে থাকার প্রয়োজনে। কেউ নানান ডিজাইনের পোশাক-পরিচ্ছদ নিয়ে ব্যস্ত। কেউ অকারণেই হাটে-বাজারে ঘুরে বেড়াতে অভ্যস্ত। কফি শপে দীর্ঘ সময় অবস্থান করা অনেকের স্বভাব। প্রচলিত কফি শপ ভালো না লাগলে, আধুনিক কফি শপ তো আছেই। সেখানে গিয়ে নষ্ট করা যাবে লম্বা সময়। আবান্তর হাস্যরসে, বিভিন্ন মনোহর বস্তুতে মত্ত থাকবে। অনেককে দেখা যায়, অঢেল সম্পদ অর্জন করার জন্য আইন অনুষদের মতো বিভিন্ন বিভাগগুলোতে পড়ে, ওকালাতি বা বড় বড় পদে আসীন হবার উদ্দেশ্যে। যাতে করে এসব পদ-পদবি তাদের জন্য অঢেল প্রাচুর্যের পথ খুলে দেয়। অন্যদিকে কেউ কেউ টাকার গাছ রোপণে সারা দিন ব্যস্ত থাকে। মোটকথা ব্যস্ত থাকার পেছনে তাদের রয়েছে হাজারটা মাধ্যম ও কারণ। কেউ অকাজে ব্যস্ত, কেউ কাজে ব্যস্ত। অকাজের ব্যস্ততা তো সবার জন্যই বর্জনীয়। কাজের ব্যস্ততাকে ধরেই কথা বলি।

আবু বকর সিদ্দিক রা. একজন ব্যবসায়ী ছিলেন। আব্দুর রহমান বিন আওফ রা.-ও ছিলেন একজন বড় ব্যবসায়ী। উসমান রা.-ও একই রকম ছিলেন। তবে তাঁদের ব্যবসা আল্লাহর জিকির, নামাজ কায়িম, জাকাত প্রদান, দ্বীনি ইলম অন্বেষণ ও রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সাহচর্য গ্রহণ করা থেকে কখনোই তাঁদের গাফিল করে রাখতে পারেনি। লক্ষণীয় যে, বর্তমানে আমরাও ব্যবসা করি আর সাহাবিগণও ব্যবসা করেছেন। তাঁদের ব্যবসা কখনো তাঁদের আল্লাহর জিকির থেকে গাফিল করতে পারেনি। কিন্তু আমাদের অবস্থা তো হলো এমন। যে, ব্যবসার জন্য আল্লাহকে স্মরণ করার সুযোগই আমরা মিলাতে পারি না!আমাদের উলামা-মাশায়িখের মধ্যে কাউকে এমনও দেখা গেছে যে, তাঁরা রমজান থেকে হজের মৌসুম পর্যন্ত ভাড়ায় গাড়ি চালিয়ে কিছু অর্থ উপার্জন করতেন। তা দিয়ে তাঁরা নিজের ও পরিবারের প্রয়োজনীয় খরচ যোগাতেন সারা বছর। আর বছরের বাকি সময় ব্যস্ত থাকতেন ইলম অন্বেষণে।

ইলম অর্জন করে আমরা অনেক কিছুই পাব। জীবনকে সমৃদ্ধ করতে পারব। পরকালের জীবনকে সাজাতে পারব অতি সুন্দর করে। কিন্তু যদি আমরা ইলম অর্জন

থেকে বিমুখ থাকি; তবে এ দুটোর কোনোটিই সম্ভব নয়। তাই ব্যস্ততার দোহাই না পেড়ে ইলম অর্জনের জন্য অবসর সময়কে কাজে লাগাই। ব্যস্ততাকে মাঝে মাঝে অবসর দিই। যেমনি সাহাবিগণ সময় দিয়েছেন, দিয়েছেন তাবিয়ি, তাবে তাবিয়িসহ আমাদের পূর্বসূরি সফল ব্যক্তিগণ।

■ বিপদের ঘনঘটা:

বর্তমানে আমাদের সময়গুলো বিভিন্নভাবে কেটে যায়। কিছু সময় গাড়ি নিয়ে রাস্তায় ড্রাইভ করা, রাতভর রূপালি পর্দায় চোখ সেঁটে রাখা। বিভিন্ন ক্লাবে আড্ডা, হ্যাং আউট করা ইত্যাদি। এতদিন এতটুকুতেই আমাদের ব্যস্ততা ছিল। কিন্তু এরপর আসলো ইন্টার একটিভ টেলিভিশন। যা এসে বল্গাহীন এ বিলাসী জীবনের বিলাসিতার ষোলোকলা পূর্ণ করল।

এভাবেই বর্তমানে আমাদের অনেক ইলমি মজলিস জনশূন্য হয়ে গেছে। কমে গেছে ইলম-পিপাসুদের সংখ্যা। এক সময়ের বিশাল বিশাল বইয়ের গ্রন্থাগারগুলো আজ পুরনো জাদুঘরে পরিণত হয়েছে। এত বিপুল জনসংখ্যা সত্ত্বেও ইলমের মারকাজগুলো আজ জনশূন্যপ্রায়। অথচ, ইলম মানুষকে অনেক কিছুই দান করে, কোনো বিনিময় গ্রহণ করে না, কোনো কিছু কেড়ে নেয় না। তবুও তো অধিকাংশ মানুষ ইলম থেকে কোনো উপকার গ্রহণ করতে চায় না। এমনকি বর্তমান সময়ের কোনো কলাকৌশল শেখার ক্ষেত্রে, পার্থিব জীবনে কাজে লাগবে-এমন কিছু শেখার জন্যও তারা আগ্রহ দেখায় না। মূলত আজকের মানুষের ইচ্ছাশক্তি ও মনোবল দুর্বল হয়ে গেছে। এমনকি অনেক শিক্ষকদেরও একই অবস্থা চলছে।ইমাম আবুল হুসাইন আল-আসাদি রহ.-এর নিকট ছাত্ররা ইলম শিখতে আসত। তিনি তাদের পড়াতেন, দরস দিতেন। একই মসজিদে তিনি প্রায় ৫০ বছর কাটিয়েছেন। সেখানে তিনি মানুষকে দ্বীনি ইলম শেখাতেন, মানব জীবনের বিবিধ সমস্যার সমাধান দিতেন। তাঁর হিম্মতে কখনো ভাটা পড়েনি, কখনো মনোবল ভেঙে পড়েনি। অথচ, তিনিও তো বিভিন্ন কাজে অনেক ব্যস্ত ছিলেন। তা সত্ত্বেও ইলমের দরস দিয়ে গেছেন নিয়মিত।

অথচ, আজ আমরা অহেতুক কার্যকলাপের কারণে সময়ই পাই না। টিভি-সিনেমা, ফিল্ম, বিভিন্ন একশন সিরিজ ইত্যাদি অসার কাহিনী দেখে দেখে সময় কাটাই। রিমোটের বোতাম টিপে টিপে এক চ্যানেল থেকে অন্য চ্যানেল দেখতে থাকি সারা দিন।

বর্তমানে পড়ালেখায় অভিনিবেশ সত্যিই অনেক কমে গেছে। শরয়ি কিতাব অধ্যয়নে মানুষের আগ্রহ ব্যাপক হ্রাস পেয়েছে। কারণ, দৈনন্দিনের অদ্ভুত রুটিন আমাদের ব্যস্ত করে রেখেছে হরেক রকম ম্যাগাজিন, উপন্যাস, টিভি প্রোগ্রাম ও নানান সিরিজ দেখার জালে। কবি বলেন:

إذا رأيت شباب الحي قد نشئوا لا ينقلون قلال الحبر والورقا ولا تراهم لدى الأشياخ في حلق

يعون من صالح الأخبار ما اتسقا فذرهم عنك واعلم أنهم همج قد بدلوا بعلو الهمة الحمقا

'যখন তুমি দেখবে পাড়ার সন্তানেরা বেড়ে উঠছে,

অথচ তারা খাতা-কলমের ব্যাগ বহন করছে না;

শাইখদের পাশে কোনো আসরেও তাদের বসতে দেখছ না,

যেখানে তারা সুবিন্যস্ত ভালো কথাগুলো শুনতে পারে;

তখন তাদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করোএবং জেনে নাও যে, তারা হলো উচ্ছৃঙ্খল ইতর শ্রেণি,

যারা উচ্চাভিলাষকে নির্বুদ্ধিতায় রূপান্তর করেছে।' (আল-আদাবুশ শারইয়্যাহ ওয়াল মানহুল মারইয়্যাহ: ১/২১২)

দুনিয়ার প্রতি অত্যধিক মগ্নতা আর অর্থ উপার্জনের লিপ্সা আমাদের দ্বীনি ইলম অর্জনের আগ্রহকে বিলোপ করে দিয়েছে। এমনকি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতেও আজ ইলমে দ্বীনের প্রতি আগ্রহ কমে গেছে।

হ্যাঁ, নিজেদের গোলমেলে এ জীবনটা শুধু অর্থ উপার্জনের পেছনেই মানুষ উৎসর্গ করছে। অর্থ-সম্পদের প্রাচুর্য পরিণত হয়েছে আমাদের লক্ষ্যে। এমনকি কেউ কেউ তো দ্বিতীয় কর্মস্থল, কেউ তৃতীয় কর্মস্থল পর্যন্ত বিস্তৃত করে তাদের অর্থ-সম্পদ বৃদ্ধির আশায়।

এটা ঠিক যে, নিত্যপ্রয়োজনীয় বিভিন্ন দ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধি, ঘন ঘন বিলের আগমন তাদের মাসিক উপার্জনকে নিঃশেষ করে দিচ্ছে। অর্থ উপার্জনের পিপাসা আজ জেঁকে বসেছে প্রায় সবার মাঝে। এ সকল বিল আর প্রয়োজন মেটানোর জন্য অর্থ উপার্জনের পেছনে পড়ে মানুষের জীবনটা ক্রমাগত দুর্বিষহ হয়ে উঠছে। জীবনধারণের পথ-পদ্ধতিগুলো সংকীর্ণ হয় যাচ্ছে দিনদিন। ফলে জুলুম-অত্যাচার ও শোকানলে দগ্ধ হওয়ার পরিমাণ কেবল বৃদ্ধিই পাচ্ছে।

এসবের অনিবার্য পরিণতিতে জ্ঞানার্জনের সেই পিপাসা লোপ পাচ্ছে। দারিদ্র্য স্বাভাবিক জীবনের শত্রু। আর যখন জীবনে অস্থিরতা আসে, তখন নিরাশদের সংখ্যা বেড়ে যায় স্বাভাবিকভাবেই। তখন মানুষ ইলম অর্জনে দীর্ঘসূত্রতা নামক ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়। করব করব করে করা হয় না, পড়ব পড়ব বলে পড়া হয় না। জীবনের স্বাভাবিকতা নষ্ট হওয়ায় ছোটবেলা থেকেই ইলমের প্রতি অনেকের অনীহা ও শিথিলতা চলে আসে। তাই সময় অনুযায়ী সঠিক শিক্ষাটা পাওয়া হয়ে ওঠে না। কবি বলেন:২২

إذا أنت لم تزرع وأبصرت حاصداً ندمت على التفريط في زمن البذر

'যখন তুমি চাষ না করে ফসল কাটার স্বপ্ন দেখবে, বীজ বপনকালীন উদাসীনতার কারণে তোমাকে লজ্জার মুখে পড়তে হবে।'(ইবনুল জাওজি রহ. কৃত হিফজুল উমরি: ৬৫)

কারও ট্রেন ছুটে গেলে সেই ট্রেনে সে আর চড়তে পারে না। তখন তা আর ফিরেও আসে না উল্টো দিকে। কিন্তু ইলম অর্জনের সময় কখনো শেষ হয় না। জীবনের যেকোনো সময় ইলম অর্জন করা যায়, এর সুযোগ অবশ্যই থাকে; যদিও কোনো ব্যক্তি বয়োবৃদ্ধ অবস্থায় উপনীত হোক না কেন।

অন্যদিকে, খারাপ লোকদের সংশ্রব ও দীর্ঘ সময় অহেতুক গল্পগুজবে ব্যয় করা দুনিয়া ও আখিরাতে কোনো কাজে আসে না। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন:

مِنْ حُسْنِ إِسْلَامِ الْمَرْءِ تَرْكُهُ مَا لَا يَعْنِيهِ

'ব্যক্তির ইসলামের সৌন্দর্য হলো, অহেতুক কথা-কাজ পরিত্যাগ করা।"
(সুনানুত তিরমিজি: ২৩১৭, সুনানু ইবনি মাজাহ ৩৯৭৬, মুসনাদু আহমাদ: ১৭৩৭)

দুনিয়া কিংবা আখিরাতে কোনো ক্ষেত্রেই উপকারে আসে না, এমন কাজ পরিত্যাগ করা ব্যক্তির দ্বীনদারিতার সৌন্দর্য প্রকাশ করে। কাজকর্মে অনাহুত হস্তক্ষেপ ঘটে- এমন বিশৃঙ্খল অবস্থা ও অস্থিরতা আমাদের শৃঙ্খলা থেকে দূরে সরিয়ে নেয়। ফলে ইলম অন্বেষণ থেকে আমরা ছিটকে পড়ি। তাই ইলমের পথে প্রতিবন্ধক এ ব্যস্ততা নামক বিপদকে, ইলমের পথে আসা অহেতুক গল্পগুজবে লিপ্ত থাকার এ আপদতুল্য ঘনঘটাকে আমরা যেন দূরে সরিয়ে দিই এবং নিজেদের সময়কে কাজে লাগিয়ে ইলম অন্বেষণ করি, ইলমকে নিজের আমলে পরিণত করি।

■ ব্যস্ত হওয়া না ব্যস্ত করে রাখা?

ব্যস্ত রাখা ও ব্যস্ত হওয়ার বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। আমাদের দুশমনেরা সস্তা বিনোদন দিয়ে আমাদের নানাভাবে ব্যস্ত রাখছে। এ ক্ষেত্রে এসব বিনোদনসামগ্রী দিয়ে আমাদের স্থানীয় যারা অর্থ উপার্জন করে থাকে, তারাও তাদের মতো অপরাধী। কাফিররা বিভিন্ন শোনা, দেখা ও পড়ার বস্তু দিয়ে আমাদের জব্দ করে রেখেছে। ফলে এ সকল বস্তু জ্ঞানার্জনের তিনটি মাধ্যমের সবটিকেই নিয়ন্ত্রণ করে রেখেছে। আল্লাহ তাআলা বলেন:

إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ

مَسْئُولًا

'নিশ্চয় কান, চোখ, অন্তঃকরণ-এদের প্রত্যেকটির ব্যাপারে জিজ্ঞেস করা হবে।'

কাফিরদের চক্রান্তের ফলে এসব কিছু আজ ব্যস্ততায় পরিণত হয়েছে। আমাদের কান, চোখ, মস্তিষ্ক সবই আজ এ সকল মন্দ বস্তুর তীব্র ও অনবরত প্রচারণার তলে দলিত। এটাই বর্তমান বিশ্বের অবস্থা। উন্নতির নামে অবনতি, ফ্যাশন চর্চা, নতুন নতুন প্রতিটি বস্তু কেনার পেছনে লেগে থাকা, তার ওপর খরচ করার একটা দৌড়ঝাঁপ ও প্রতিযোগিতা চলছে। এসব সময় ও অর্থ নষ্ট করা ছাড়া আর কিছুই নয়।

আমাদের পূর্বসূরিগণ আল্লাহর ইবাদত, জিকির, তিলাওয়াত ও সালাতে রাত জাগতেন। কিন্তু আজ মানুষ অনর্থক কাজে রাত জাগে, অনেকে রাত জেগে জেগে পাপাচারে লিপ্ত থাকে। আমরা আমাদের শত্রুদের ফাঁদে পড়ে অবাধ্যতা ও অনৈতিকতায় বিভোর হয়ে রাতযাপন করছি। জবরদখলকারী শত্রুদের তৈরিকৃত এসব উপকরণের মাধ্যমে আমরা আল্লাহর ইবাদত ও দ্বীন থেকে দূরে থাকছি, বিমুখ হয়ে রয়েছি দ্বীনি শিক্ষা থেকে।

দুঃখের বিষয়, আমরা ইলমের মতো দামি সম্পদ, মূল্যবান পাথেয় হারিয়ে বসেও আনন্দে আছি! অথচ সাহাবিদের মধ্য থেকে কারও কোনো একটি হাদিস ছুটে গেলে

সুরা বনি ইসরাইল: ৩৬

আফসোস করে তিনি বলতেন:

أَلْهَانِي الصَّفْقُ بِالْأَسْوَاقِ

'বাজারে গিয়ে কেনাবেচা করা আমাকে এ হাদিস থেকে বঞ্চিত করেছে। '(উমর ইবনুল খাত্তাব রা. থেকে বর্ণিত, সহিহুল বুখারি: ২০৬২)

তাদের বিবেচনায় আমরা আজ কোথায়? তাঁরা তো পরিবারের ভরণপোষণের জন্য বাজারে গিয়ে ব্যবসা করতেন। কারণ, পরিবারের খরচ যোগাড় করা ওয়াজিব। আর আমাদের ব্যস্ততা? দেখি তো আমাদের ব্যস্ততাগুলো নিম্নোক্ত কোন প্রকারে পড়ে?

১. কিছু ব্যস্ততা মৌলিক দিক থেকেই যৌক্তিক। আর কিছু ব্যস্ততা অবস্থার কারণে যৌক্তিক। যেমন: জীবিকা উপার্জন করা, পরিবারের দেখাশোনা করা ও সন্তান লালনপালন ইত্যাদি মৌলিকতা ও প্রয়োজনীয়তা উভয় দিক থেকেই যৌক্তিক। এ ব্যস্ততা এমন দীর্ঘকালীন হয় না যে, তা আমাদের পুরো ২৪ ঘণ্টা দিনের পুরোটাই গিলে খাবে।

২. কিছু ব্যস্ততা মৌলিক দিক থেকে যৌক্তিক বটে, কিন্তু অবস্থা বা প্রয়োজনের বিবেচনায় অযৌক্তিক। যেমন: বিনা প্রয়োজনে ব্যবসার কাজে লেগে থাকা। চাকরি-বাকরিতে মশগুল থাকা। একটু ব্যাখ্যা করে বললে,
ব্যবসা বা চাকরি করা তো আমার জীবিকা অর্জনের জন্য অপরিহার্য। তাই ব্যবসা বা চাকরি মৌলিক বিবেচনায় যৌক্তিক। কিন্তু বিনা প্রয়োজনে ব্যবসার পেছনে লেগে থাকা কিংবা চাকরিতে ডুবে থাকা তো অপ্রয়োজনীয়; তাই এ ব্যস্ততা অযৌক্তিক।

৩. আর কিছু ব্যস্ততা আছে, যেগুলো মৌলিকভাবেই অযৌক্তিক এবং কিছু ব্যস্ততা আছে, যা সম্পূর্ণ হারাম। যেমন: কোনো গুনাহের কাজে ব্যস্ত থাকা, বিলাসিতায় ডুবে থাকা, বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে ঘুরে সময় নষ্ট করা। এক ব্যক্তি বলল, আমি অমুক মুভি দশ বার দেখেছি!! বর্তমান সময়ে এমনই ঘটছে। অথচ, এগুলো হচ্ছে উত্তেজনামূলক ও প্রেমাসক্তির আমি খোর কারণে উত্তেজনাই বাড়তেঅথচ, এগুলো হচ্ছে উত্তেজনামূলক ও প্রেমাসক্তির গল্প। এ মুভি দেখার কারণে উত্তেজনাই বাড়তে থাকে। এমনিভাবে রাতের ১২ টার সময় যখন শহরে বিদ্যুৎ চলে যায়, তখন হোটেলের রেস্টরুম বা এপার্টমেন্টগুলোর চড়া দাম ওঠে। কারণ, তারা তো চায় রাতে জাগ্রত থাকতে। তাই তাদের জন্য দরকার হচ্ছে পারস্পরিক সম্মতি। কিন্তু সেখানে কী হয়? দুনিয়ার ভোগ-বিলাসিতায় মজে থাকা, আরাম-আয়েশে ব্যস্ত থাকা, মার্কেটে নতুন কোনো বস্তু এলেই তা কিনে ফেলা, বন্ধুবান্ধবের সাথে আড্ডা দেওয়া, বাজারে-মার্কেটে সময় নষ্ট করা, কফি শপে গিয়ে লম্বা সময় ধরে উপভোগ করা ইত্যাদি নানান বেহুদা বিষয়ে আজ আমাদের আসক্তি জমে গেছে। রাস্তা-ঘাটে, ঘরে-বাইরে সর্বত্র আমাদের ব্যস্ত রাখার কোনো না কোনো উপকরণ মজুদ আছেই। এসবের দ্বারা লাভ কী?! এসবের মাধ্যমে কী পাচ্ছি আমরা? আমাদের সময়গুলোকে গলা চিপে হত্যা করার এই দীর্ঘ লিস্ট তাদের পরিকল্পিত। তাদের নীল নকশা এমন যে, যাতে একটি স্থানেই আমাদের লম্বা একটা সময় কেটে যায়। আপনি যদি একটু চিন্তা করে দেখেন, (তো সহজেই বুঝতে পারবেন যে,) এসব বিলাসিতা ও বিনোদন করে আমাদের কোনো উপকারই হচ্ছে না, হবেও না। কেবল সামান্য বিলাসিতাই হবে, সামান্য বিনোদিতই হওয়া যাবে। কিন্তু তার পরে সবই উড়ে যাবে কপূরের ন্যায়।

■ ইলমের প্রতি সালাফের আগ্রহের কিছু নমুনা:

আমরা আজ ভুলে আছি, কীসে আমাদের অধিক ব্যস্ত থাকার কথা আর কীসে কম। আমরা ভুলে বসেছি অনেক কিছুই। আমরা ভুলে গেছি, আমাদের কর্মপন্থা কী হওয়া উচিত আর কী নয়। কিন্তু সে কর্মপন্থা জানার জন্যও তো আমাদের জ্ঞানার্জন অপরিহার্য। কিন্তু আমাদের মাঝে সে উপলব্ধি কই? কোথায় আমাদের সে আগ্রহ?একদা ইমাম ইয়াহইয়া আল-লাইসি রহ. ইমাম মালিক রহ.-এর কিছু শাগরেদের সাথে তাঁর দরসে বসে ছিলেন। ওই সময় একজন বলে উঠল, 'হাতি এসেছে!' তার এই আওয়াজ শুনে দরসের সবাই চলে গেল হাতি দেখতে;কেবল ইয়াহইয়া-ই বসে থাকলেন দরসে। ইমাম মালিক রহ. তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'তুমি কেন হাতি দেখতে গেলে না? স্পেনে তো হাতি নেই!' উত্তরে ইমাম ইয়াহইয়া বললেন, 'আমি আমার দেশ থেকে আপনাকে দেখতে এবং আপনার নির্দেশনা ও ইলম শিখতে এসেছি। হাতি দেখার জন্য নয়।' তাঁর জবাব শুনে ইমাম মালিক রহ. আশ্চর্যান্বিত হলেন, তাঁকে উন্দুলুসের জ্ঞানী বলে আখ্যা দিলেন। আর সত্যি সত্যিই এক সময় তিনি স্পেনের জ্ঞানের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। (তারতিবুল মাদারিক ওয়া তাকরিবুল মাসালিক: ৩/৩৮৩)

প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস আবু আসিম আন-নাবিল রহ.। তাঁকে নাবিল উপাধি দেওয়া হয়েছিল। যার অর্থ শ্রেষ্ঠ। একবার বসরায় হাতি আসলো। তা দেখার জন্য সবাই সেদিকে ছুটে গেল। তখন একমাত্র আবু আসিম ব্যতীত ইবনে জুরাইজ রহ.-এর সকল শাগরেদ মজলিস ছেড়ে হাতি দেখতে বেরিয়ে পড়েছিলেন। শাইখ তাঁকে বললেন, 'কী হলো? হাতি দেখতে যাওনি যে?' তিনি বললেন, 'আপনার দরসের তো অন্য কোনো প্রতিরূপ নেই।' শাইখ তাকে বললেন, 'তুমি নাবিল। তুমি শ্রেষ্ঠ।' দরসের কোনো প্রতিরূপ না থাকার অর্থ হলো, আপনার দরস ছুটে যাবে, এ দরস মহামূল্যবান, এটা তো হাতছাড়া করা যায় না। এ দরস ছুটে গেলে আরেকটা পাব কোথায়? কিন্তু একটা হাতি দেখতে না পারলেও বেঁচে থাকলে আরেকটা দেখতে পাওয়া যাবে।

لهم همم لا منتهى لكبارها وهمته الصغرى أجل من الدهر

'তাদের ছিল উচ্চ মনোবল, এ উচ্চতা

সীমাহীন।
সবচেয়ে ক্ষুদ্র মনোবলও তার যুগের চেয়েও শক্তিশালী।'

বৃদ্ধ বয়সে হাফিজ সালাফি রহ. বলেন, 'আমার বয়স ৬০ বছর হলো। আমি কখনো ইস্কান্দারিয়ার মিনার পুরোপুরি দেখিনি। এ কক্ষ থেকে যতটুকু দেখা যায়, এর চেয়ে বেশি নয়।' ইস্কান্দারিয়ার মিনারটি প্রাচীন পৃথিবীর সপ্তাশ্চার্যের একটি। দেখুন, সালাফ কখনো অনর্থক কাজে সময় নষ্ট করতেন না। তারা কেবল কোনো বিনোদন বা মনোহর দৃশ্য দেখার জন্য এমন কিছুর পেছনে সময় নষ্ট করার পক্ষপাতী ছিলেন না।
স্বাভাবিকত মানুষের কিছুক্ষণ বিশ্রাম নেওয়ার প্রয়োজন হয়। মাঝেমধ্যে ভ্রমণ করে আর আল্লাহর নিয়ামতরাজি দেখে। আল্লাহর সৃষ্টিতে রয়েছে তাঁর তাওহিদের প্রমাণ। এ সৃষ্টি প্রত্যক্ষ করলে ইমান বৃদ্ধি পায়। কিন্তু এ ভ্রমণ আজ অলস ও অকর্মণ্যদের আনন্দভ্রমণে রূপ নিয়েছে। এই ভ্রমণ বা বিশ্রামে আরাম-আয়েশের নামে দুষ্ট চরিত্রের লোকজন নানান খারাপ কাজে লিপ্ত হয়। এ সফরে কারও বিবাহ হয়, এ সফরের পরিণতিতে কারও ঘটে বিবাহ-বিচ্ছেদের ঘটনা। কেউ কেউ জিওয়াজুল মিসফার বা সফরকালীন বিয়ে করে বসে এবং বাজারে মেয়েদের সাথে সহাবস্থানসহ ইত্যাদি নানান অনৈতিক কাজে লিপ্ত হয়। আমাদের অবস্থা হয়েছে এমন যে, আমরা বর্তমানে প্রবৃত্তিপ্রিয় ও উত্তেজনাকর এক পৃথিবীতে বাস করছি। এই অশ্লীলতার স্রোতে কেউ কোনো ধরনের বাধার তোয়াক্কা করে না। এটা অবশ্যই অত্যন্ত ভয়ংকর বিষয়। এ সকল লোক এতটুকুতেই ক্ষান্ত নয়। তারা অশ্লীলতার এ বিশ্বায়নে আরও কিছুকে হালালের ব্যানারে চালিয়ে দিতে চাইছে। আজ এই অশ্লীলতাগুলো আমাদের কর্মব্যস্ততায় রূপান্তরিত হয়েছে। কেউ কেউ এখন মিসয়ার জাতীয় বিবাহ করতে চায়, প্রথমে একটি তারপর আরেকটি এভাবে চারটি, তারপর ঘরে, বাইরে এমন বিবাহের মাধ্যমে সেতার জীবনকে বিলাসিতার আতিশয্যে ছেয়ে ফেলে।
মোটকথা, আমাদের মন-মানসিকতা, শরীর-স্বাস্থ্য সকল কিছুতে এগুলো মহামারির রূপ নিয়েছে। এসব করার প্রতি উদ্বেলিত করার জন্য অনেক কারণই বর্তমান দুনিয়ায় আছে। বর্তমানে তো এসব সমস্যার সমাধানে ক্লিনিক, ওষুধ, শক্তিবর্ধক ইত্যাদি মজুদ আছেই। যার ফলে এ সকল ভোগবিলাসী চিন্তা আমাদের মন-মস্তিষ্ক ও আত্মাকে গিলে ফেলছে। হায়, যদি মানুষ এগুলোর পরিবর্তে ইলম নিয়ে ব্যস্ত থাকত!

হায়, সালাফের আগ্রহ আর আমাদের আগ্রহ! আমরা তাদের চেয়ে কোথায় আর কতটা দূরে!

■ সাহাবায়ে কিরাম রা.-এর কিছু দৃষ্টান্ত:

যদি আমরা সাহাবায়ে কিরাম রা.-এর জীবনের প্রতি লক্ষ করি, তাহলে অনায়াসে আমরা জানতে পারব, তাঁরা জীবিকা উপার্জনে কেমন ছিলেন। তাঁরা কি সব সময় জীবিকা অন্বেষণে ব্যস্ত থাকতেন? ইলম ও আমলের জন্য কি সময় দিতেন না? জীবিকা ও ইলম অর্জনের ক্ষেত্রে তাদের কর্মপন্থা ছিল এমন যে, তাঁরা অন্য সাথিদের সাথে নিজেদের পালা ভাগ করে নিতেন। সময়গুলোকে ভাগ করে নিতেন অত্যন্ত সুন্দরভাবে। সাজিয়ে নিতেন নিজেদের গুরুত্বপূর্ণ ও সম্পূরক কাজগুলো।
উমর রা. ও তাঁর এক প্রতিবেশী পালাক্রমে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর দরবারে যেতেন। তিনি বলেন, 'আমি ও আমার এক আনসারি প্রতিবেশী। আমরা দুজনে পালাক্রমে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর দরবারে যেতাম। একদিন সে যেত, আরেকদিন আমি যেতাম। যেদিন আমি যেতাম, সেদিন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নিকট অবতীর্ণ ওহি ও অন্যান্য খবরাখবর নিয়ে আসতাম এবং তাকে বলতাম। পরের দিন সে গেলেও একই কাজ করত।'
ব্যস্ততার এ যুগে ইলম অন্বেষণইবনে হাজার রহ. ইমাম বুখারি রহ. থেকে বর্ণিত এই হাদিসের টীকায় বলেন:
'একজন প্রকৃত ইলমপিপাসু তার জীবনোপকরণ ও পরিবারের দেখাশুনা করা থেকে যেমনিভাবে গাফিল হয় না, তেমনই সে তার ইলম অর্জনের মূল দায়িত্ব থেকেও গাফিল হয় না। এমনকি জীবিকা উপার্জনের জন্য কোনো দিন যদি সে ইলমের মজলিসে উপস্থিত হতে না পারে, তাহলে ছুটে যাওয়া ইলম হাসিল করার জন্য বিভিন্ন পন্থা অবলম্বন করে সে তা অর্জন করে নেয়।" ছুটে যাওয়া ইলমও তারা পরে অর্জন করে নিতেন। কারণ, তারা মনে করতেন যে, ইলম অর্জন করাটা তাদের আসল কাজ। অথচ, আজ ইলম অর্জন করা আমাদের অতিরিক্ত কাজ আর অন্য সকল কাজ গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বে পরিণত হয়েছে। এ তো অধিক বলে ফেললাম। কারণ, আজকাল ছাত্ররা মূলত দরস থেকেই অনুপস্থিত থাকে।

ইবনে হাজার রহ. বলেন, 'উমর রা. জীবিকার জন্য ব্যবসা করতেন এবং সেখান থেকে তিনি আল্লাহর রাস্তায় দানও করতেন।
উসমান রা. ছিলেন একজন ধনী সাহাবি। কিন্তু তাঁর ধনভান্ডার তাঁকে ইলম থেকে ফিরিয়ে রাখতে পারেনি। আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ পরিচালনায় মুসলিম সেনাদের জন্য তিনি অঢেল সম্পদ ব্যয় করে দিয়েছেন। এমনিভাবে আব্দুর রহমান বিন আওফ রা.-এর যখনই জীবিকার প্রয়োজন হতো, তখনই তিনি বাজারে গিয়ে কেনাবেচা করে ব্যবসা করে নিতেন।'
সাহাবায়ে কিরামের ব্যবসাও আমাদের মতো আমদানি-রপ্তানি, লেনদেন, ক্রয়-বিক্রয়, পরিবেশন ও চুক্তিভিত্তিক ছিল। তাঁরা ব্যবসায়িক কাফেলা প্রেরণ করতেন। সেসব কাফেলা শামে গিয়ে বিভিন্ন পণ্যসামগ্রী কিনে আনত। এরপর তারা সেগুলো মদিনায় বিক্রি করতেন। একইভাবে ইয়েমেন থেকে জিনিসপত্র রপ্তানি করে বিভিন্ন স্থানে বিক্রয় করা হতো। এভাবে তাঁরা এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় পণ্য আনা-নেওয়া করতেন। যে অঞ্চলে যে পণ্যের প্রাচুর্য, সেটা নিয়ে যেখানে পণ্যের ঘাটতি আছে সেখানে বিক্রয় করতেন। লাভের বিক্রয়মূল্যে ব্যবসা করতে কাউকেকরতেন। লাভের বিক্রয়মূল্যে ব্যবসা করতে কাউকে দায়িত্ব দিয়ে পাঠাতেন। এভাবে তারা আমদানি-রপ্তানি ও বাজারজাত করে ব্যবসা করতেন।

আব্দুর রহমান বিন আওফ রা. বাজারে গিয়ে একটি পণ্য কম দামে ক্রয় করে তার চেয়ে বেশি মূল্যে বিক্রি করে দিয়েছেন। ব্যবসায় অর্জিত অর্থ দিয়ে তাঁরা তাঁদের পরিবার-পরিজন পরিচালনা করতেন, উম্মাতে মুসলিমার উন্নতি, অগ্রগতি ও তাদের রক্ষার জন্য খরচ করতেন।

কোনো কোনো সাহাবির নিকট মূলধনই ছিল না। তবুও কি তাঁরা ইলম অর্জন ও দান-সদাকা ছেড়ে দিয়েছেন?! তাঁরা ব্যবসা না করে থাকলে, তারা সর্বদা কী করতেন?

আনাস বিন মালিক রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর দরবারে কিছু লোক এসে বলল, "আমাদের সাথে আপনি কিছু লোক পাঠান। যারা আমাদের কুরআন-সুন্নাহ শেখাবে।" তাদের কথানুযায়ী তিনি ৭০ জন

আনসার সাহাবিকে পাঠালেন তাদের সাথে, যাদের কারি বলা হতো। তাদের মাঝে আমার মামা হারামও ছিলেন। তাঁরা কুরআন মাজিদ পাঠ করতেন। রাতে কুরআন নিয়ে পর্যালোচনা করতেন এবং কুরআন শিক্ষা দিতেন। দিনে তাঁরা মসজিদে পানি এনে রাখতেন। জালানি কাঠ সংগ্রহ করে তা বিক্রয় করতেন এবং তা দ্বারা আহলুস সুফফা ও অসহায়-দরিদ্র মানুষদের জন্য খাবার ক্রয় করতেন। এই লোকদের রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের সাথে প্রেরণ করেছিলেন।' (সহিহু মুসলিম: ৬৭৭) অর্থাৎ তাদের কাছে কোনো মূলধন ছিল না। তাই তারা কাঠ সংগ্রহ করতেন। একজন সাহাবির ভাষায়, 'আর আমরা তা বহন করতাম।' কতিপয় সাহাবি নিজে বহনকারী হিসেবে কাজ করতেন, যেন কিছু অর্জন করে তা দ্বারা পানি কিনে মসজিদে রাখা যায়।

লক্ষণীয় হচ্ছে, কাঠ সংগ্রহ ও পানি বহন করার কাজটা করতেন গরিব সাহাবিগণ। এর মাধ্যমে তাঁরা তাদের জীবিকা উপার্জন করতেন। অতঃপর তা থেকে সদাকাও করতেন। আমাদের কাছে কি তাদের এ সদাকার পরিমাণ কম মনে হচ্ছে? এমনটা ভাবার কোনো কারণ নেই; কেননা, অনেক ক্ষেত্রে এক দিরহামের দান ফজিলতের দিক থেকে একশ দিরহামের দানের চেয়েও বেশি হয়ে থাকে। যাহোক এসব কাজ তাদের কখনোই ইলম অর্জন থেকে বিরত রাখতে পারেনি। সাহাবিগণকে ইলম অর্জন থেকে কোনো কিছুই বিরত রাখতে পারত না। তারা আগা থেকে গোড়া, শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সবকিছু শেখার আগ্রহ রাখতেন, শেখার চেষ্টা করতেন, শেখার জন্য রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে বারবার প্রশ্ন করতেন। এমনকি দাস-দাসীর সাথে কীভাবে কথা বলতে হয়, সে ধরনও তারা শিখে নিতেন।

ইবনে জুবাইর রা.-এর ১০০টি গোলাম ছিল। তাদের ভাষা ছিল ভিন্ন ভিন্ন। তিনি তাদের প্রত্যেকের সাথে প্রত্যেকের ভাষায় কথা বলতেন। অর্থাৎ তিনি সকলের ভাষা জানতেন।

এভাবে জাইদ বিন সাবিত রা.-ও তিনটি ভাষা শিখেছেন। আর প্রতিটি ভাষা শিখতে তিনি সময় নিয়েছেন গড়ে ১৫ দিন করে।

সাহাবায়ে কিরাম নিজেদের সর্বদা ইলম অন্বেষণে, জ্ঞান অর্জনে ব্যস্ত রাখতেন। অথচ, আজ আমরা নিজেদেরকে তাঁদের উত্তরসূরি দাবি করি; কিন্তু তাঁদের আমল,

তাঁদের শেখা-শেখানোর আগ্রহের সিকি ভাগও ধারণ করি না। আল্লাহ আমাদের সহায় হোন।

■ ব্যস্ততাকে পাশ কাটিয়ে ইলম অন্বেষণে সালিহিনের জীবনের কিছু খণ্ড চিত্র:

হাম্মাদ বিন জাইদ রহ. বলেন, 'আমাকে আইয়ুব রহ. বলেন, "তুমি তোমার বাজার (ব্যবসা) ছেড়ে দিয়ো না। কারণ, তুমি যতদিন তোমার ভাইদের মুখাপেক্ষী না হবে, ততদিন তাদের কাছে সম্মানিত হয়ে থাকবে।" (হিলইয়াতুল আওলিয়া ও তাবাকাতুল আসফিয়া: ৩/১১)

ইমাম আবু হানিফা রহ.-এর রেশমি কাপড়ের কাজ করার এরুটি বাদ ঘর ছিল। তাঁর কাছে অনেক পোশাক-শ্রমিক ওকারিগর থাকত। অর্থাৎ তিনিও প্রায় ব্যস্ত ছিলেন।

ইবনুল মুবারক রহ.ও একজন ব্যবসায়ী ছিলেন। আবার তিনি ফিকহ, হাদিস ও জুহদের ইমামও ছিলেন।

আমরা তিন জন ইমামের অবস্থা জানলাম। প্রথম জনকে আইয়ুব রহ. এমন কথা বলার কারণ আমরা বুঝতে পারি যে, তিনি ইলম অন্বেষণের জন্য ব্যবসা ছেড়ে দিতে চাইছিলেন। অথচ, আমরা দিনদিন আমাদের ব্যবসা, আমাদের চাকরিতে আরও ডুবে যাচ্ছি। ইমাম আবু হানিফা রহ. এত বড় ইমাম ছিলেন, এত অধিক পরিমাণ ইলম চর্চা করতেন। কিন্তু তিনিও একজন ব্যবসায়ী ছিলেন। তারও তো ব্যবসার ব্যস্ততা ছিল। অথচ, আমরা ব্যবসার অজুহাত দেখিয়ে ইলম থেকে দূরে থাকি! ইমাম ইবনুল মুবারক রহ.ও তো ব্যবসায়ী ছিলেন। কিন্তু তার ইলম অর্জনের পথে তার ব্যবসা কি বাধা হতে পেরেছে?

একইভাবে উজির আওনুদ্দিন আবুল মুজাফফার বিন হুবাইরাহ রহ. ছিলেন একজন বড় আলিম, মুহাদ্দিস ও ফকিহ। মন্ত্রিত্বের গুরুদায়িত্ব তাঁকে ইলম অন্বেষণ, কিতাব

রচনা ইত্যাদি কাজ থেকে বিরত রাখতে পারেনি। তিনি মন্ত্রিত্বের দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি ইলম অর্জনেও নিবেদিত ছিলেন। সিয়ারু আ'লামিন নুবালার মধ্যে ইমাম জাহাবি রহ. এমনই বলেছেন।

হামজা বিন হাবিব আজ-জাইয়্যাত রহ.। তিনি সাত কারিদের একজন ছিলেন। তিনি কুফা থেকে হালওয়ানে তেল আমদানি করতেন। এ জন্যই তাঁকে জাইয়্যাত বলা হতো।ইয়াকুব বিন সুফইয়ান আল-ফাসাওয়ি রহ. ফারেসে হাদিস বিশারদদের ইমাম ছিলেন। তিনি রাতে অর্থের বিনিময়ে বিভিন্ন বই লিখতেন। এর দ্বারা দিনের বেলায় তাঁর খরচ ও ইলম অর্জনের অর্থ জোগাড় হয়ে যেত।

আল্লামা কাফফাল আল-মারওয়াজি রহ. শাফিয়ি মাজহাবের একজন বড় আলিম ছিলেন। তাঁর পেশা ছিল তালা বানানো ও তা মেরামত করা।

ইমাম নববি রহ. তাঁর বাবাকে দোকানের কাজে সহায়তা করতেন। এই কাজ তাঁকে সেই অল্প বয়সেও পবিত্র কুরআন হিফজ করায় বাধা দিতে পারেনি।

শাইখ মুহাম্মাদ বিন ইসমাইল হায়িক একজন সাধারণ ব্যক্তি হিসেবে বড় হচ্ছিলেন। সাধারণ হওয়া সত্ত্বেও তিনি ছিলেন একজন ইলমপ্রিয় মানুষ। তিনি আলিমদের মজলিসে বসতেন। সেখানে তাদের ইলমি আলোচনা শ্রবণ করতেন এবং বরকত হাসিল করতেন। তা ছাড়া তিনি মসজিদে প্রথম কাতারে দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করতেন। তাই শাইখ তাকে অনেক আদর-স্নেহ করতেন। তাকে না দেখলে তার কথা অন্যদের জিজ্ঞেস করতেন। এ বিষয়টি তাকে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ করে তোলে। তিনি কিতাবাদি ক্রয় করলেন। অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে ইলম অন্বেষণে মনোযোগ দিলেন। অবশেষে তাঁর এই প্রচেষ্টা তাকে একজন বিখ্যাত, মেধাবী ও মর্যাদাবান ব্যক্তিত্বে পরিণত করল। তিনি জ্ঞানের বিশেষ শাখাগুলোতে অতি দক্ষ হিসেবে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। তিনি এতই শীর্ষে পৌঁছেছেন যে, তাঁর জমানায় তিনিই ফিকহ ও উসুলে একজন বিদগ্ধ আলিম হয়েছিলেন। মানুষ তাঁর কাছে অনেক জটিল জটিল মাসআলার সমাধানের জন্য আসত। তিনি সেগুলোর সমাধান দিয়ে দিতেন, যেগুলোর উত্তর অনেক বড় এবং কেউ এর সহজ সমাধান দিতে পারতেন না।

আলি কাজবার রহ. মিসকিইয়াহ বাজারের একজন দর্জিছিলেন। শাইখ আলি তানতাবি রহ. বলেন, 'আলি তো ছিলেন উমাইয়া আমলে মসজিদের দরজা।' কাজ শেষে তিনি দোকান বন্ধ করে মসজিদে গিয়ে ইলমি মজলিসে বসতেন। সেখানে তিনি পড়তেন, শিখতেন, গভীর অধ্যয়নে ডুবে থাকতেন। এমনকি একটা সময় তিনি দরসে শাইখের সামনেও পড়তে লাগলেন। এ সময় তিনি দোকানও ছেড়ে দেননি, তার কাজও ছাড়েননি, ইলমও ছাড়েননি। এভাবে বেশ কিছু সময় চলতে থাকল। তিনি সকল বিষয়ে ব্যাপক পাণ্ডিত্য অর্জন করলেন। অবশেষে একদিন শাইখ মারা গেলে সেই হালাকায় উপস্থিত হন গভর্নর, বিশেষ ব্যক্তিবর্গ ও বড় বড় লোকজন। তারা শাইখের ইনতিকালের পর আজ প্রথম দরসের উদ্দেশ্যে এসেছিলেন। তাঁরা এসে খুঁজতে লাগলেন যে, শাইখের পর কে তাঁর স্থলাভিষিক্ত হবেন? কিন্তু কাউকেই খুঁজে পাওয়া গেল না। অতঃপর তারা পরীক্ষা করতে শুরু করলেন যে, কে এই দায়িত্ব পালন করতে পারবেন? কিন্তু কাউকেই এমন যোগ্য পেলেন না যে, শাইখের এ দরস চালিয়ে যাবেন। অবশেষে তারা আলি কাজবারের খোঁজ করতে লাগলেন। খুঁজতে খুঁজতে শাইখ আলি কাজবার রহ.-কে পেলেন। তিনি তাঁর দোকানে কাপড় সেলাই

করছিলেন। তারপর তারা তাঁকে নিয়ে আসলেন। এরপর তিনি দরস দিতে আরম্ভ করলেন। তিনি এমনভাবে দরসে ব্যাখ্যা করতে লাগলেন যে, উপস্থিত সকলে হতবাক হয়ে গেল। এভাবে তিনি একজন দোকানদার হয়েও দীর্ঘ ১৫ বছর যাবৎ দরস চালিয়ে যান। তাঁর পরে তাঁর বংশধরেরা মসজিদে খুতবা দেওয়ার দায়িত্বে আজও আছেন।

জীবিকার জন্য আয় উপার্জন করা আবশ্যক। তবে আয় উপার্জন ও ইলম অন্বেষণের মাঝে অবশ্যই সমন্বয় রাখতে হবে। আমরা যদি দুটির মাঝে প্রতিযোগিতা করি, তবে কোনটি প্রাধান্য পাবে? কতটুকু সম্পদ দিলে একজনের মনে পরিতৃপ্তি আসবে, তার জন্য তা যথেষ্ট হবে? সে আরও সম্পদ অর্জনের জন্য সামনে অগ্রসর হবে না?

ইমাম নববি রহ. বলেন, 'সালাফ এ বিষয়ে একমত হয়েছেন যে, "নফল নামাজ, নফল রোজা, তাসবিহ ইত্যাদি নফল আমলে ব্যস্ত না হয়ে ইলম অন্বেষণে ব্যস্ত হওয়া অধিক উত্তম।"(ইমাম নববি রহ.-এর আল-মাজমু: ১/২০) তাহলে বর্তমানে যে স্থল-

ভ্রমণ,ইন্টারনেটে সময়ক্ষেপণ, স্টক মার্কেটে চক্কর লাগানো ইত্যাদি অযৌক্তিক কর্মে ব্যস্ত, তার ব্যাপারে আমরা কী বলতে পারি! তাই তো কবি বলেছেন:

ولا تحفل بمالك وأله عنه فليس المال إلا ما علمت
وليس الجاهل في الناس معنى ولو ملك العراق له تأتى وما يغنيك تشييد المباني إذا
بالجهل نفسك قد هدمت جعلت المال فوق العلم جهلاً العمرك في القضية ما عدلت
وبينهما بنص الوحي بون ستعلمه إذا طه قرأت لئن رفع الغني لواء مال لأنت لواء
علمك قد رفعت وإن جلس الغني على الحشايا لأنت على الكواكب قد جلست وإن ركب
الجياد مسومات لأنت مناهج التقوى ركبت وليس يضرك الإقتار شيئاً إذا ما أنت ربك قد
عرفت

'সম্পদের প্রতি মনোযোগ দিও না, এ

থেকে বিমুখ হও।

কারণ, তোমার জ্ঞান ব্যতীত, তোমার কোনো সম্পদই নেই।

মানুষের মাঝে অজ্ঞ ব্যক্তির কোনো মূল্যায়ন নেই, যদিও সমগ্র ইরাক রাজ্য তার করায়ত্তে থাকে।

তোমার দালানের সুদৃঢ়করণ কোনো কাজে আসবে না, যখন তুমি নিজেকে ধ্বংস করে দিচ্ছ অজ্ঞতার আঁধারে।

তুমি না বুঝে ইলমের ওপর সম্পদকে প্রাধান্য দিলে, তোমার জীবনের শপথ, তুমি সিদ্ধান্ত নিতে ইনসাফের আশ্রয় নাওনি।

ওহির ভাষ্যে প্রমাণিত (সম্পদ ও ইলম) উভয়ের মাঝে রয়েছে কত পার্থক্য! যদি তুমি সুরা তহা পড়ো, তাহলে অবশ্যই জানতে পারবে।

ধনী যদি তার সম্পদের পতাকা উড্ডীন করে, তবে তুমি তো তোমার ইলমের পতাকা সমুন্নত করে তুলে ধরবে।ধনী যদি তার অর্থের জোরে তুলতুলে তোশকে

বসতে পারে, তবে তুমি তো তোমার জ্ঞানের আলোয় তারকারাজির ওপর বসতে সক্ষম।
যদি সে উন্নত ঘোড়ার পিঠে আরোহণ করতে পারে, তবে তুমি তো তাকওয়ার বাহনে আরোহণকারী যাত্রী।

শুনে রেখো, কোনো গর্ত (অপূর্ণতা) তোমার কোনোই ক্ষতি করতে পারবে না, যদি তুমি তোমার রবকে চিনে থাকো।'

পাঠক, আপনি যদি দরিদ্রও হয়ে থাকেন, তবুও তো আপনি বেশি বেশি অর্থ-সম্পদ তালাশ করেও ঠিক ততটুকআপনি বেশি বেশি অর্থ-সম্পদ তালাশ করেও ঠিক ততটুকু সম্পদই নিজের করে পাবেন, যতটুকু আপনার তাকদিরে ছিল। কিন্তু ইলম অন্বেষণ করলেন, আপনি যেন হাতে পেলেন আকাশের তারকা, আপনি তখন দরিদ্র হয়েও হবেন উঁচু মর্যাদা ও উন্নত সম্মানের অধিকারী।

■ ইলম অর্জনের জন্য কিছু সময় নির্ধারণ করে রাখা:

একজন মুসলিম যতই ব্যস্ত থাকুক না কেন, ইলমে দ্বীন অধ্যয়নের জন্য, ইসলামের সকল বিধিবিধান, হুকুম-

আহকাম, মুআমালাত-মুআশারাত ও ইবাদত শেখার জন্য কিছু সময় অবশ্যই নির্ধারণ করতে হবে; যাতে সে এগুলোর চর্চা করবে। এমনকি সে তার পেশাসংশ্লিষ্ট জ্ঞানও লাভ করতে পারে। যিনি ডাক্তার, তিনি যেন তার ডাক্তারি বিষয়ে, বিশেষ করে মহিলাদের পর্দাবিষয়ক, মহিলাদের চিকিৎসাসংক্রান্ত বিষয়গুলো, সৌন্দর্যবর্ধনে করা সার্জারির হুকুম-আহকামসহ বিবিধ বিষয় সম্পর্কে অবশ্যই জেনে নেন। এমনকি গবেষণাসংক্রান্ত, জিন, প্রজনন শাস্ত্র, অঙ্গ প্রতিস্থাপন ইত্যাদির শরয়ি হুকুম-আহকাম সম্পর্কেও তাকে জানতে হবে।

এমনিভাবে একজন শিক্ষকেরও অবশ্য কর্তব্য যে, ফিকহ শাস্ত্র সম্পূর্ণ আয়ত্ত করে নেওয়া। বিশেষ করে ছাত্রদের মাঝে বিচারসংক্রান্ত বিষয়গুলো, যেগুলো দ্বারা তিনি তার ছাত্রদের মাঝে ন্যায়বিচার করতে পারবেন। আবার একজন অধ্যক্ষের জন্য অবশ্য কর্তব্য যে, পরিচালনার বিষয়ে দক্ষতা অর্জন করে নেওয়া। বিশেষ করে সকলের অধিকার, সকলের সাথে কৃত অঙ্গীকার, ছাত্রদের শাস্তি প্রদানবিষয়ক, শাস্তি দেওয়ার হুকুম-আহকাম, কতটুকু শাস্তি দেওয়া জায়িজ, কতটুকু স্বাভাবিক, কতটুকু ন্যায়সংগত, প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন নিয়মকানুন নির্ধারণ করা, কীভাবে বিষয়াদি বিচার করা হবে ইত্যাদি বিষয় জানা তার জন্য অপরিহার্য।

এমনিভাবে একজন ব্যবসায়ীর কর্তব্য হলো,

ব্যবসাসংক্রান্ত শরয়ি সকল বিষয় সম্পর্কে জ্ঞান লাভকরা। বেচাকেনা, বন্ধক, আমানত, ঋণ, ব্যবসায়িক চুক্তি, ব্যবসায়িক বিমা করা না করা, ব্যাংক-খাতা খোলা না খোলা ইত্যাদি সকল বিষয় তাকে জানতে হবে। আপনারা এমন অনেক ব্যবসায়ীকে দেখেছেন যে, তারা ঠিকমতো জাকাত দেয় না। তাকে জিজ্ঞেস করলে বলে, 'আমি তো জাকাতের পরিমাণের চেয়েও অনেক বেশি সদাকা করি। তাহলে জাকাত আর

কেন দেবো? আমি এত মিলিয়ন মিলিয়ন টাকা জাকাতের পেছনে ব্যয় করতে পারব না।' তাদের অন্তরে দুনিয়ার ভালোবাসা, সম্পদের মোহ জেঁকে বসেছে, তাদের অন্তরের গভীরে রয়েছে দুনিয়া ও সম্পদের ভালোবাসা। এমন হলে তারা কীভাবে মিলিয়ন মিলিয়ন জাকাতের টাকা প্রদান করবে? তারা এমন কৃপণতা করে এটা ভাবে যে, তাদের জন্য এসব টাকা-পয়সা কল্যাণকর হবে। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন:

(بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

'বরং এটা তাদের পক্ষে একান্তই ক্ষতিকর প্রতিপন্ন হবে। যেসবে তারা কার্পণ্য করে সে সমস্ত ধন-সম্পদকে কিয়ামতের দিন তাদের গলায় বেড়ি বানিয়ে পরানো হবে। '(সুরা আলি ইমরান: ১৮০)

হে ভাই, ব্যস্ততার কথায় আসি এবার। ইলমে আত্মনিয়ে করে যেন ব্যক্তি আত্মতৃপ্তি ও পূর্ণতা অনুভব করে। আ মানুষ এমন আছে, তারা তাদের জীবনকে একই চালিয়ে আসছে। তাদের একেক জনের বয়স যদি হয় ত্রিশ, কেননা তারাএকটি বছরকেই ত্রিশ বছর ধরে জীবনযাপন করে আসছে। তাদের জীবনে না কোনো নতুনত্ব এসেছে, না এসেছে কোনো অভিনবত্ব, না আছে কোনো উন্নতি বা উৎকর্ষ।
অভিধানপ্রণেতা ফাইরুজাবাদি রহ. বলতেন, 'আমি তো দৈনিক ২০০ লাইন মুখস্ত না করে ঘুমাতাম না। (আল-কামুসুল মুহিত)
আবু ইসহাক আল-হারবি রহ. আহমাদ রহ. সম্পর্কে বলেন, 'আমি তাঁকে সব সময় এমন দেখতাম যে, তিনি গত দিনের চেয়ে আজ আরও বেশি পরিশ্রম করেছেন।'কতক ব্যবসায়ী ছিলেন, তারা ফজরের পরপরই তাদের দোকান খুলতেন। এরপর কুরআনে কারিমের মাসহাফ খুলে তিলাওয়াত শুরু করতেন। যতক্ষণ গ্রাহক না আসত, ততক্ষণ তাদের তিলাওয়াত চলতে থাকত। গ্রাহক এসে চলে গেলে আবার আগের মতো তিলাওয়াতে ব্যস্ত থাকতেন। আর এটা তাদের বাপ-দাদাদের কাছ থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া আমল ছিল। এমন কতিপয় লিমুজিন-ড্রাইভার আছেন, যারা মাগরিব থেকে ইশা পর্যন্ত গাড়ি বন্ধ রেখে মসজিদে চলে যান। এখনো এমন ড্রাইভার এ মসজিদে আছেন।

মুসা আ. তাঁর জাতির নবি ছিলেন। যখন তিনি জানতে পারলেন যে, সমুদ্রের কিনারে এক লোক আছেন। যিনি তাঁর চেয়ে অধিক জ্ঞানী। তখন তিনি বনি ইসরাইলদের নিয়ে ব্যস্ত থাকা সত্ত্বেও তাঁর কাছে ছুটে গেলেন। অবশ্যই তা আল্লাহর নির্দেশ পাওয়ার পর হয়েছে। আর এই সফরে তাঁকে অনেক কষ্টও সহ্য করতে হয়েছে। কুরআনে বর্ণিত ইরশাদ হচ্ছে:

فَلَمَّا جَاوَزَا قَالَ لِفَتَاهُ آتِنَا غَدَاءَنَا لَقَدْ لَقِينَا مِن
سَفَرِنَا هُذَا نَصَبًا

'যখন তারা আরও অগ্রসর হলেন, মুসা তাঁর সঙ্গীকে বললেন, "আমাদের নাশতা নিয়ে এসো, আমরা এই সফরে পরিশ্রান্ত হয়ে গেছি।"(সুরা আল-কাহফ: ৬২)

ذَرِينِي أَنَلْ مَا لَا يُنَالُ مِنَ العُلَى فصعب العلى في الصعب والسهل في السهل تريدينَ
إِدْرَاكُ المَعَالِي رَخِيصَةً ولا بد دون الشهد من إبر النحل

'ছেড়ে দাও আমায়, আমি অনর্জিত উচ্চতায় আরোহণ করব, অনন্য উচ্চতায় আরোহণ করা কষ্টসাধ্য, কিন্তু সমতল ভূমিতে চলা খুবই সহজ, তোমরা অনেক সস্তায় মর্যাদার উচ্চাসনে সমাসীন হতে চাও, অথচ, (তোমরা যেন জানোই না যে,) মৌচাকের মধু পেতে হলে মৌমাছির হুল খেতে হয়।'সময় না পাওয়ার অর্থ এ নয় যে, জ্ঞান অন্বেষণ থেকে দূরে থাকব যদি কেউ দ্বীনি ইলম অর্জনের জন্য সময় বের করতে না পারে, তবুও তার জ্ঞানার্জনের দায়িত্ব শেষ হয়ে যায়নি। আর যদি কেউ এর জন্য পরিপূর্ণ সময় নির্ধারণ করতে না পারে অথবা আলিমদের মজলিসে বসার সুযোগও তার না মিলে, তাহলে সে অবশ্যই নিজের সাধ্যানুযায়ী চেষ্টা করবে। যতটুকু তার পক্ষে সম্ভব হবে, ততটুকু করবে। কারণ, যদি সম্পূর্ণটা সে নাও পায়, তবে কিছুটা হলেও তার পাওয়া হবে।

আমরা জানি-অনেক সাহাবি, তাবিয়ি, তাবে' তাবিয়ি ও মুহাজির নিজের, সন্তান-সন্ততির ও পরিবারের নানা ব্যস্ততা এবং ব্যবসা-বাণিজ্য থাকা সত্ত্বেও ইলম অর্জন ছেড়ে দেননি। তাদের ব্যবসা তাদের সারা জীবন ব্যস্ত করে রাখেনি। কিন্তু তারা প্রত্যেকে যে ব্যবসা করতেন, বিষয়টা এমনও নয়।

আবু হুরাইরা রা. সারা জীবন কখনো ব্যবসা করেননি। তিনি বলেন:

إِنَّ إِخْوَانَنَا الْمُهَاجِرِينَ كَانَ يَشْغَلُهُمُ الصَّفْقُ بِالْأَسْوَاقِ وَإِنَّ إِخْوَانَنَا مِنْ الْأَنْصَارِ كَانَ يَشْغَلُهُمْ الْعَمَلُ فِي أَمْوَالِهِمْ وَإِنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ كَانَ يَلْزَمُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشِبَعِ بَطْنِهِ وَيَحْضُرُ مَا

لَا يَحْضُرُونَ وَيَحْفَظُ مَا لَا يَحْفَظُونَ

আর আনসার'আমাদের মুহাজির ভাইদেরকে বাজারের ব্যবসা ব্যস্ত করে রাখত। আর আনসার ভাইয়েরা খেত-খামারি নিয়ে ব্যস্ত ছিল। আর আবু হুরাইরা সর্বাবস্থায় রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সাথে থাকতেন, তাঁর কাছে খাবার খেতেন। তিনি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সাথে এমন সময় থাকতেন, যে সময় অন্যরা থাকতেন না, ফলে তিনি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর এমন অনেক আমলই দেখতেন, যা অন্যরা দেখতেন না এবং এমন সবকিছু মুখস্থ করতেন, যেগুলো অন্যরা মুখস্থ করতে পারতেন না।'(সহিহুল বুখারি: ১১৮)

অনেকে আবু হুরাইরা রা.-এর ব্যাপারে বলতে পারেন যে, তিনি এত দেরিতে ইসলাম গ্রহণ করে কীভাবে এত বেশি হাদিস বর্ণনা করেছেন?

সেটা সম্ভব হয়েছিল, কারণ তিনি তার পুরো সময়টাই ইলমের জন্য উৎসর্গ করেছিলেন।

যাদের ব্যস্ততা আছে, তারা প্রতিদিন কুরআনের একটি পাতা পড়তে পারেন। প্রতিদিন একটি আয়াতের তাফসির দেখতে পারেন। প্রতিদিন একটি করে আয়াতের হিফজ করতে পারেন। হাঁটার সময়টা কাজে লাগাতে পারেন। বিশেষ করে, যে সকল শহরে জ্যাম আছে, সেখানে দেখা যায় গাড়িতে বসে বসে দু-তিন ঘণ্টার মতো সময় কেটে যায়। এমন সময়গুলোকে কাজে লাগানো যায় কুরআন তিলাওয়াত করে, দ্বীনি বই পড়ে। বাসায় আসা-যাওয়ার পথে ইলমি আলোচনা শোনা যায়। কিন্তু হায়,

আমারমুসলিম ভাইয়েরা গাড়িতে বসে বসে কিংবা হাঁটতে হাঁটতে কানে ইয়ারফোন লাগিয়ে কী শুনছে!?

■ প্রযুক্তির মাধ্যমে জ্ঞানার্জন:

আল্লাহ তাআলা আমাদের আধুনিক এসব যন্ত্র কেন দান করেছেন? কেন এগুলো আমাদের জন্য সহজলভ্য করলেন? আমাদের কাছে বর্তমানে ইলেক্ট্রিক অনেক ডিভাইস আছে। আপনার কাছে টেপরেকর্ডার আছে,টেপ আছে, সিডি-ভিসিডি আছে, আছে বিভিন্ন রকমের প্লেয়ার। এমপি থ্রি'র মাধ্যমে দরস শোনার সুযোগ আছে। এমনকি দরস যদি ভিডিও আকারে থাকে, তবে এমপি ফোর আছে। এ সকল প্লেয়ার গাড়িতেও চালানো যায় খুব সহজে। এরপর আরও রয়েছে এফ এম রেডিও। আরও আছে লম্বা লম্বা এমএমএস দেখার পদ্ধতি। এসব আধুনিক আসবাবগুলো আজ আমাদের হাতের মুঠোয়। এখন আমাদের হাতে হাতে টাচ স্ক্রিন ফোন। আঙুল দিয়ে স্পর্শ করে আমরা যেকোনো কিছুই ব্রাউজ করতে পারি সহজে। এগুলোর মাধ্যমে আপনি সহজে বিপুল পরিমাণ কিতাব পড়তে পারেন। এখন তো অনেক মোবাইলেই সহজে এমন ইলেকট্রনিক কিতাব পড়া যায়। এসবের মধ্যে যেমনিভাবে পুরো দুনিয়া ঢুকে আছে, তেমনই ইলমের বিশাল বিশাল সমুদ্রও ঢুকে আছে। এগুলোর জন্য আবার বিশেষ ডিভাইসও আছে। বর্তমানে এমাজন ইলেকট্রনিক বই বের করেছে, যা হাতের তালুতে সহজেই ধারণ করা যায়। এ ইলেক্ট্রনিক বইয়ের পাতাসূর্যের প্রখর কিরণের নিচেও পড়তে অসুবিধে হবে না।

এ সকল মনিটরসমৃদ্ধ ডিভাইসগুলো আরও উন্নতি করছে। এগুলোকে অচিরেই ফোল্ড করে, ভাঁজ করে রাখার প্রযুক্তি আসছে। এমনকি ল্যাপটপের মনিটরকেও। সামনে এমনও নতুন আবিষ্কারের কথা উৎপাদনকারীরা বলছে যে,এমন মনিটরসমৃদ্ধ ডিভাইস আসবে, যা হাতের কব্জিতে লেপটে নেওয়া যাবে। ইলম তো আল্লাহরই কাছে, কিন্তু এসব তো কেবল মাধ্যম। এসব তো আমাদের জন্য ইলম গ্রহণ করা অতি সহজ করে দিয়েছে। যে ব্যক্তি যে কাজে ব্যবহার করে, সে তেমনই ফল পাবে। কিন্তু আমাদের উচিত এগুলোকে আমাদের অধ্যয়নের কাজে লাগানো। এগুলোর সঠিক ব্যবহারের মাধ্যেমে আমরা দ্বীনি ইলম হাসিল করতে পারি।

অনেক ওয়েব সাইট-ই আছে যেগুলো থেকে অডিও, ভিডিওসহ বিভিন্ন কন্টেন্ট মোবাইলে ডাউনলোড করে রাখা যায়। বর্তমানে তো অনেক অনলাইন ইউনিভার্সিটিও আছে, যেখানে ইন্টারনেটের মাধ্যমে শিক্ষা দেওয়া হয়। অনলাইনভিত্তিক অনেক ইউনিভার্সিটি আছে, যেগুলো ধনী ছাত্রদের থেকে পাঠ্য উপাদান নিয়ে দরিদ্র ছাত্রদের প্রদান করে থাকে।

এ ছাড়াও বিভিন্ন জায়গায় অপেক্ষা করার ক্ষেত্রগুলোতে, অপেক্ষার সময়গুলোতে; যেমন হাসপাতাল, গাড়ির জন্য অপেক্ষা ইত্যাদি জায়গায় আমরা আমাদের এমন সময়গুলোকে কাজে লাগাতে পারি। তখন আমরা পকেট থেকে মোবাইল বা ব্যাগ থেকে ল্যাপটপ খুলে বিভিন্ন কিতাব অধ্যয়ন করতে পারি।

এমনিভাবে আমরা IPTV প্রযুক্তি ব্যবহার করে ইন্টারনেটের মাধ্যমে সম্প্রচার দেখতে পারি। আবার সে সম্প্রচারকৃত ঔদরসটি ল্যান পদ্ধতিতে ওয়াইফাই সংযুক্তির মাধ্যমে সহজেই সার্ভার থেকে ডাউনলোড করতে পারি। যাকে বলা হয়-Video on demand (VOD)। যতটুকু আপনার দরকার পড়ে, ততটুকু আপনি ডাউনলোড করতে পারেন সহজেই। যেটা সম্প্রচারিত হয়ে গেছে, সেটা ওখানে স্টোর করা থাকে। আপনি কেবল আপনার পছন্দসই ইলমের প্রোগ্রামটা নির্বাচন করে দেখতে বা ডাউনলোড করতে পারেন। IPTV প্রযুক্তিকে সুবর্ণ একটা সুযোগ হিসেবে কাজে লাগানো যায়। কারণ, এর মাধ্যমে বিভিন্ন ইলমি চ্যানেল তৈরি করা সম্ভব। মোবাইল দিয়েই এমন চ্যানেল তৈরি করা যায়, যেমন নাকি আমরা টেলিভিশনের মাঝে দেখে থাকি।

বিভিন্ন শাইখের অনেক ইলমি আলোচনাই তো রয়েছে এ সকল চ্যানেলে। আমরা সেগুলোকে বিভিন্ন স্থানে আপলোড করে, ক্লাউড স্টোরেজে সংরক্ষণ করে, কিংবা আমাদের কাছে দ্রুত পদ্ধতিতে ডাউনলোড করে রাখতে পারি। আজকাল তো ডাউনলোড স্পিড অনেক বেশি। তাই অপেক্ষা করার ঝামেলাটি আর থাকছে না।

আবার দেখুন, গুগল অ্যানড্রয়েড ফোন তৈরি করে বাজারজাত করছে। এর মাধ্যমে আমরা সহজেই কোনো কিছু ব্রাউজ করতে পারি, পড়তে পারি, কোনো কিছু সার্চ করে বের করতে পারি। ম্যাক কোম্পানি থেকে আইফোন বেরিয়েছে, যা দ্বারা একই কাজ করা যায় সহজে।এখন এসব ডিভাইসের মধ্যে সহজেই হাজার হাজার পৃষ্ঠা

ডাউনলোড করে রাখা যায়। আজ আমরা এমন এক যুগে বাস করছি, যখন সংরক্ষণ পদ্ধতি অনেক উন্নত ও দ্রুতগতির। তা ছাড়া দিনদিন তো এমন অনেক গবেষণার ডিভাইস আসছেই। এগুলো যদি আমরা সঠিক কাজে ব্যবহার করতে না পারি, তবে এগুলোর অর্থ কী? ধরুন, ল্যাপটপ। এর মাঝে দুটা হার্ডডিস্ক আছে। দুই টেরাবাইট হার্ডডিস্ক তো অনেক বিশাল। এর মাঝে আপনি বহু কিতাব, দরসের অডিও-ভিডিও রাখতে পারবেন অনায়াসে।

আরও আছে মাকতাবাতুশ শামিলা। এটি তো আজ সহজলভ্য। এমনকি এ ইলেক্ট্রনিক মাকতাবাতে আসল কিতাবের প্রতিলিপিও আছে। যদি আপনার কাছে টেক্সট ভার্সনে কোনো সন্দেহ দেখা দেয়, তবে আপনি সহজেই আসল নুসখা দেখে প্রকৃত তথ্য সম্পর্কে নিশ্চিত হতে পারেন।

আমরা সহজেই প্রযুক্তি ব্যবহার করে আমাদের সময়কে কাজে লাগিয়ে ইলম অর্জন করতে পারি। এ ক্ষেত্রে ব্যস্ততা থাকা না থাকার ওজর একেবারেই অনর্থক-অযৌক্তিক।

■ দৃঢ় ইচ্ছাশক্তি ও পরিপূর্ণ নিয়ত:

কিন্তু হে ভাই, সমস্যা হচ্ছে সাহস ও নিয়ত নিয়ে। আল্লাহর শপথ, দৃঢ় ইচ্ছাশক্তি, বিশুদ্ধ নিয়ত, সঠিক
পদক্ষেপ, আল্লাহর প্রতি একনিষ্ঠতা, সময়ের প্রতি গুরুত্ব, সুস্থতা ও কর্মোদ্যমের সময়কে গনিমত মনে করা, গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলো সঠিক সময়ে সম্পাদন করা, ছটে যাওয়া কাজকে পরবর্তী সময়ে আদায় করে নেওয়া,ছুটে যাওয়া কাজকে পরবর্তী সময়ে আদায় করে নেওয়া, সময়মতো কাজ করা, আধুনিক আবিষ্কারগুলোকে কাজে লাগানো, দুশ্চিন্তার পূর্বের অবসর সময়কে কাজে লাগানো, পরস্পরকে সাহায্য করা, খারাপ ও অলসদের থেকে দূরে থাকা, যেকোনো কাজে যেকোনো জায়গায় অপেক্ষার সময়গুলোকে কাজে লাগানো, চিন্তা-গবেষণার সাথে মুতালাআ করা-যদিও তা অনেক লম্বা সময় নেয়, তবুও আপনি আপনার মস্তিষ্ককে কাজে লাগালেন-বিলম্ব না করে কাজ শুরু করে দেওয়া, দীর্ঘসূত্রতা করে কালক্ষেপণ না করার মতো ইত্যাদি মহৎ গুণগুলো এবং এই ইচ্ছাশক্তিগুলো আমাদের মাঝে থাকতে হবে। এই যুগে এসে আমাদের ইলম অর্জনের জন্য কোনো উপকরণের কমতি নেই। প্রযুক্তি সবগুলোকেই সহজ করেছে। আমাদের ওপর আল্লাহর প্রমাণ আরও অধিক প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আমাদের সালাফ তো ইলম অন্বেষণ ও আল্লাহর ইবাদতের ক্ষেত্রে দৃঢ় ইচ্ছশক্তির অধিকারী ছিলেন। আমাদেরও তাদের মতোই হতে হবে।

একব্যক্তি দৃঢ় ইচ্ছাশক্তির অধিকারী ছিলেন। তিনি এর বলেই অনেক ইলম অর্জনে সক্ষম হয়েছিলেন। তার একটি রুটির কারখানা ছিল। সেখানে তিনি সকাল চারটা হতে মাগরিবের আগ পর্যন্ত কাজ করতেন। কারখানাটি ছিল অন্ধকার পাতাল কক্ষের মতো। প্রচণ্ড গরমও ছিল সেখানে। এসব কঠিন অবস্থায়ও তিনি সেখানে থেকে ওরশ ও হাফসের কিরাতে পবিত্র কুরআন হিফজ করেছেন। 'কিতাবুত তাওহিদ', 'সুল্লামুল উসুল', 'বাইকুনিয়াহ', 'আল-আরবাউনান নাবাবিয়্যাহ', 'আল-আজরুমিয়্যাহ', 'আল-উসুলুস সালাসাহ', 'মাতনু তুহফাতিল আতফাল','আল-উসুলুস সালাসাহ', 'মাতনু তুহফাতিল আতফাল', 'উমদাতুল আহকাম', 'আল-জাজরিয়্যাহ' ও 'মিলহাতুল হারিরি' ইত্যাদি কিতাব তিনি আয়ত্ত করে ফেলেছেন জীবিকার জন্য তার এত ব্যস্ততা থাকা ও এত পরিশ্রম করা সত্ত্বেও।একবার চিন্তা করে দেখুন, 'একজন রুটি তৈরিকারী।

অন্ধকার পাতাল কক্ষে বসে এত অধিক গরমের মাঝে। মুতালাআ করে চলছিলেন এতগুলো কিতাব! তার ওপর দু'কিরাতে কুরআনের হিফজ!'
যখন আমরা কিছু লোকের প্রতি লক্ষ করি, যেমন কিছু বিদেশী শ্রমিকের কথা বলি, তারা হাঁটা-চলার সময় ও তাদের কর্মক্ষেত্রে যেন তাদের অবশ্যই মিউজিক শুনতেই হবে। তারা মিউজিক শোনার যন্ত্রকে কোমরে রাখে, কানে রাখে ইয়ারফোন। আর নির্দ্বিধায় মিউজিক শুনতে থাকে। আশ্চর্য! আমরা যারা নিজেদের খাইরে উম্মাহ দাবি করি, যারা বলি, আমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের প্রতি ইমান রাখি, সেই আমরা কেন এই সময়গুলোকে কাজে লাগাই না? অথচ এখন টেকনোলজির কারণে ইলম অর্জন করা একেবারেই সহজ! কোথায় হারিয়ে গেল আমাদের বোধশক্তি?

উমর রা. বলেন, 'যেদিন আমি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর দরবারে যেতাম, সেদিনের সকল খবরাখবর (ইলম, ওহি) আমি তাকে (তাঁর এক নির্ধারিততাকে (তাঁর এক নির্ধারিত সাথি) জানাতাম। যেদিন সে যেত, সেও এসে আমাকে সেদিনের সবকিছু জানাত।'

সাহাবায়ে কিরাম ইলম অর্জনের ক্ষেত্রে পরস্পরকে সহায়তা করতেন। তাঁরা এটিকে মূলনীতি বানিয়ে নিয়েছিলেন। একে অপরকে ইলম শেখার ব্যাপারে উৎসাহ দিতেন। অনেক শাইখ তো এমন ছিলেন যে, তাঁরা অনেক ব্যস্ততা থাকা সত্ত্বেও পবিত্র কালামে মাজিদকে বারবার হিফজ থেকে পড়ে পুনঃনিরীক্ষণ করতেন, একজন অপর জনেরটা শুনতেন। তারা শুরু থেকে নতুন করে আবার ইলম অন্বেষণে আগ্রহী ছিলেন। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন:

اغْتَنِمْ خَمْسًا قَبْلَ خَمْسٍ :شَبَابَكَ قَبْلَ هَرَمِكَ، وَصِحَّتَكَ قَبْلَ سَقَمِكَ، وَغِنَاكَ قَبْلَ فَقْرِكَ، وَفَرَاغَكَ قَبْلَ شُغْلِكَ، وَحَيَاتَكَ قَبْلَ مَوْتِكَ

'পাঁচ জিনিস আসার আগে পাঁচ জিনিসকে গনিমত মনে করো। ১. তোমার বার্ধক্য আসার আগে যৌবনকে, ২. অসুস্থতা আসার আগে সুস্থতাকে, ৩. দারিদ্র্য আসার আগে সচ্ছলতাকে, ৪. ব্যস্ততা আসার আগে অবসরকে ৫. এবং মৃত্যু আসার আগে জীবনকে।'(মুসতাদরাকুল হাকিম: ৪/৩০৬)

ইবনুল জাওজি রহ. বলেন, 'আমার ছোটবেলার কথা মনে পড়ে। তখন আমি অনেক ছোট ছিলাম। বয়স প্রায় ছয়। ছোট থাকলেও আমার ছিল দৃঢ় ইচ্ছাশক্তি ও উচ্চ মনোবল। আমি ছিলাম বড় শিশুদের সহপাঠী। আমি জামিআর খোলা ময়দানে গিয়ে খুঁজতাম যে, মুহাদ্দিসগণ কোথায় হাদিসের দরস দিচ্ছেন। অতঃপর আমি তাদের দরসে উপস্থিত হতাম এবং যা শুনতাম সবই মুখস্ত করে নিতাম। তারপর বাড়িতে গিয়ে সেগুলো লিখে রাখতাম।'

উমর রা. বলেন:

تَفَقَّهُوا قَبْلَ أَنْ تُسَوَّدُوا

'নেতৃত্ব গ্রহণের পূর্বেই ইলম অর্জন করে নাও।'

আর ইমাম বুখারি রহ. বলেন:

وَبَعْدَ أَنْ تُسَوَّدُوا

'নেতা নির্বাচিত হওয়ার পরেও জ্ঞানার্জন চালিয়ে যাও। ' (সহিহুল বুখারি: ১/২৫)

খাল্লাল রহ. বলেন, 'একদা একব্যক্তি ইমাম আহমাদ রহ.-কে বললেন, "আমি ইলমে দ্বীন অর্জন করতে চাই। কিন্তু আমার মা আমাকে নিষেধ করছেন। তিনি চাইছেন, আমি যেন ব্যবসা-বাণিজ্য নিয়ে থাকি।" তখন ইমাম আহমাদ রহ. লোকটিকে বললেন, "তুমি তোমার বাড়িতেও থাকবে (মায়ের কথা মানবে) এবং ইলম অন্বেষণও করবে।""ইলমে দ্বীনের জন্য কষ্ট সহ্য করা ও ধৈর্যধারণ করা
ইলমে দ্বীন হাসিলের জন্য অবশ্যই ধৈর্যধারণ করতে হবে এবং কষ্ট সহ্য করার মানসিকতা থাকতে হবে। কেননা, ইলম কখনো নিজ থেকে চলে আসবে না। এ জন্য অনেক কষ্ট সহ্য করতে হবে। কবি বলেন:

دَبَيْتَ لِلْمَجْدِ وَالسَّاعُونَ قَدْ بَلَغُوا جَهْدَ النُّفُوسِ وَأَلْقَوْا دُونَهِ الْأُزْرَا فَكَابَدُوا الْمَجْدَ حَتَّى مَلَّ أَكْثَرُهُمْ وَعَانَقَ الْمَجْدَ مَنْ أَوْفَى وَمَنْ صَبَرَا لَا تَحْسَبِ الْمَجْدَ تَمْرًا أَنْتَ آكِلُهُ لَنْ تَبْلُغَ الْمَجْدَ حَتَّى تَلْعَقَ الصَّبِرَا

'তুমি মর্যাদার জন্য হামাগুড়ি দিচ্ছ, অথচ প্রচেষ্টাকারীরা

করে গেছে প্রচণ্ড পরিশ্রম, ফেলে দিয়েছে লুঙ্গির গিঁট।

তারা মর্যাদা পেতে সংগ্রাম করে অধিকাংশই হয়ে পড়েছে ক্লান্ত-শ্রান্ত

অবশেষে যারা পূর্ণ প্রচেষ্টা চালিয়েছে এবং ধৈর্যধারণ করেছে তারাই মর্যাদার দেখা পেয়েছে।মর্যাদাকে এমন কোনো খেজুর ভেবো না, যা তুমি চাইলেই খেয়ে ফেলতে পারবে।
মর্যাদার উচ্চাসনে তো তুমি তখনই উঠতে পারবে, যখন ধৈর্যের পূর্ণ স্বাদ আস্বাদন করবে।

■ 'অবসর আমাদের জন্য গনিমত:

যেকোনো ব্যবসায়ী বা চাকুরিজীবীই কিছু অবসর সময় পেয়ে থাকে। যখন বছরে সে একমাসের ছুটি নেয়, তখন তো সময়ের অভাবই হয় না। এ ছাড়া অনেক অবসর সময় তো এমনিই পাওয়া যায়। গ্রীষ্মকালীন ছুটি, বাৎসরিক ছুটি, মাসিক ছুটি ইত্যাদি অনেক ছুটি থাকে। আবার প্রতিদিন ডিউটি শেষ হওয়ার পরও অবসর সময় থাকে। আবার অনেক চাকরিজীবীরা কাজের ফাঁকেও অবসর সময় পেয়ে থাকেন। এ সময় তাদের মধ্যকার কেউ পত্রিকা পাঠ করে, কেউ কুরআন তিলাওয়াত করে, কেউ গান শুনে, কেউ বিভিন্ন ইলমি বিষয় শ্রবণ করে।আমরা যখন কোনো কিছুর অপেক্ষায় থাকি, তখন এ সময়গুলো আমাদের থেকে বিদায় নিয়ে যায়। অথচ আমাদের একটুও আফসোস হয় না। কেউ বিমানবন্দরের লাউঞ্জে বসে অপেক্ষা করতে থাকেন। কারণ, বিমানের শিডিউল লেট হয়েছে। অলস বসে না থেকে পকেট থেকে মোবাইলটা বের করে কিছু কিতাবাদি পড়ুন। ডিভাইসে এমন কিছু অ্যাপসও আছে, যাতে পূর্বে পড়া বিষয়বস্তুকে বুকমার্ক করে রাখার অপশন আছে, যেন আপনি পুনরায় সেটি পড়তে পারেন। এটাকে কাজে লাগাতে পারেন।এমনিভাবে মেমোরিতে (বৈদ্যুতিক স্মরণিকা) সে সকল পুস্তক-পুস্তিকা সংরক্ষণ করে রাখতে পারেন, যা দীর্ঘ এক বছর আগে পড়া হয়েছে। যাতে পুনরায় পড়ে আপনি তা থেকে, আপনার সে গুরুত্বপূর্ণ ও চয়িত কিতাবগুলো থেকে উপকার অর্জন করতে পারেন। এগুলো মস্তিষ্কে ধারণ করার প্রক্রিয়াটি চালাতে পারেন। একবার উপকার নিয়ে আবার তা থেকে উপকার নিতে পারেন।আমাদের পূর্বসূরিদের মধ্যে অনেকেই হাঁটাচলা অবস্থায়ও পড়াশুনা করতেন। আবু বকর বিন খাইয়াত আন-নাহবি রহ. সব সময় পড়ার মধ্যে লেগে থাকতেন। এমনকি তিনি রাস্তায় চলার সময়ও পড়তেন। এর ফলে অনেক সময় তিনি নদীর পাশের খাড়া ঢাল থেকে নিচে গর্তে পড়ে যেতেন। আর আল্লামা খতিব আল-বাগদাদি রহ. রাস্তা দিয়ে হাঁটার সময়ও তার হাতে কিতাবের কিছু অংশ থাকত। তিনি তা পড়তেন।হিলইয়াপ্রণেতা আবু নুআইম আল-আসবাহানি রহ. পাঠদানে ব্যস্ত থাকতেন। যখন দরসগাহে যাওয়া হতো,তখনও তিনি পড়াতেন। আবার তিনি যখন বাড়িতে যেতেন, তখনও তাকে পড়িয়ে শোনানো হতো। রাস্তায় হেঁটে হেঁটে পড়ার কারণে তো সালাব আন-নাহবি রহ.-এর মৃত্যুই ঘটে যায়। জুমার দিন আসরের পর তিনি জামে মসজিদ থেকে বের হয়ে হাঁটছিলেন। তখন

তার মধ্যে কিছুটা বধিরতা কাজ করছিল। অনেক কষ্ট করে তিনি কিছুটা শুনতে পেতেন। সে সময় তার হাতে একটি বই ছিল। যেগুলোর দিকে তিনি রাস্তায় হাঁটাবস্থায় তাকাচ্ছিলেন। হঠাৎ একটি ঘোড়া তাকে ধাক্কা দিয়ে গর্তে ফেলে দিল। পরের দিন তিনি ইনতিকাল করেন।খলিফা আল-মুতাওয়াক্কিলের মন্ত্রী আল-ফাতাহ বিন খাকান রহ. যখন নামাজে বের হতেন বা কোনো প্রয়োজনেখাকান রহ. যখন নামাজে বের হতেন বা কোনো প্রয়োজনে বাইরে যেতেন, তখন তিনি হাতে করে কিতাবের কিছু পৃষ্ঠা নিয়ে বের হতেন। সেগুলো রাস্তায় পড়তে পড়তে তার গন্তব্যস্থানে যেতেন।

শাইখ বিন বাজ রহ. 'আলফিয়াতুল ইরাকি' নামক গ্রন্থ মুখস্থ করেছেন প্রতিদিন অজু করতে করতে। প্রতিদিন একটি কি দুটি করে পঙ্ক্তি পড়তে পড়তে তিনি পুরোটাই মুখস্থ করে ফেলেছেন।বরকতময় সেই সত্তা, যিনি আমাদের হিম্মত বা উচ্চ মনোবল দিতে সক্ষম; যদিও আমাদের শরীর-স্বাস্থ্য সে পর্যন্ত উপনীত হতে সক্ষমও না হয়।

■ উপসংহার:

পরিশেষে বলা যায়, দ্বীনি ইলম কেবল জ্ঞান অর্জনের মাধ্যম নয়, বরং এটি জান্নাতে যাওয়ার সহজ পথ এবং আত্মশুদ্ধির মূল চাবিকাঠি। ইহকালীন কল্যাণ ও পরকালীন মুক্তির জন্য দ্বীনি শিক্ষা অর্জন করা প্রত্যেক মুসলিমের ওপর ফরজ বা আবশ্যক। অন্ধকারাচ্ছন্ন সমাজে আলোর দিশারী হিসেবে এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনে সঠিক জ্ঞান অর্জনের কোনো বিকল্প নেই। তাই আমাদের উচিত, জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে কোরআন ও সুন্নাহর সঠিক জ্ঞান অর্জন করে তা নিজ জীবনে বাস্তবায়ন করা এবং প্রচার করা।